—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

মধু-মিলন

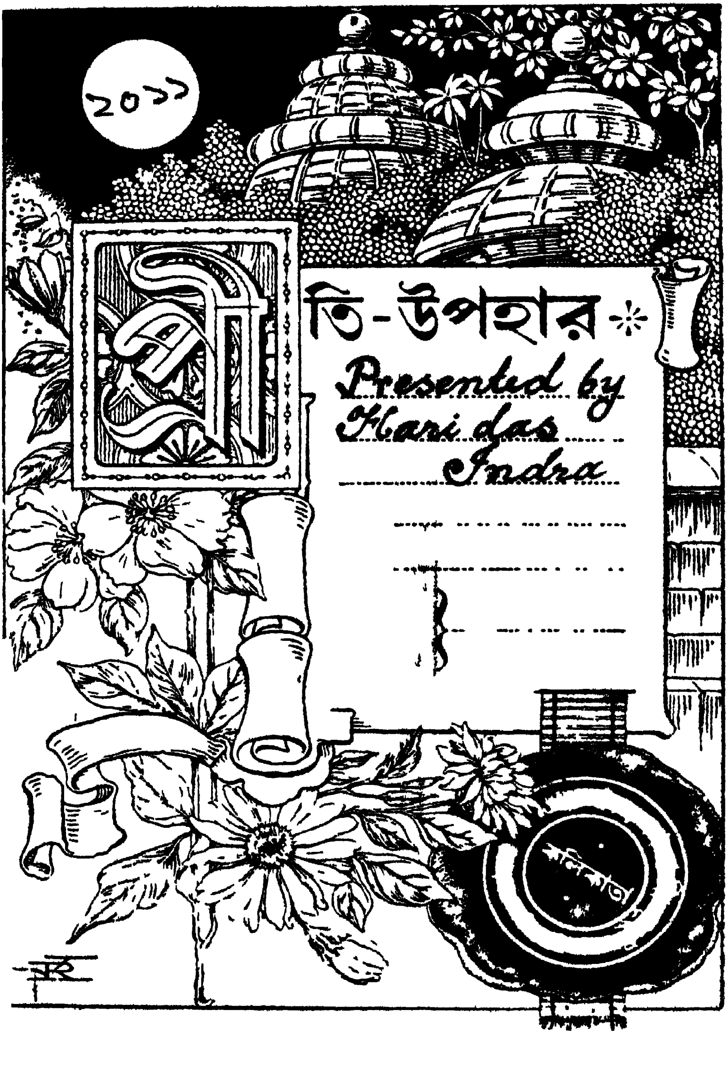
শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসী

—এক টাকা—

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ
রথযাত্রা—১৩৫২

প্রিণ্টার—বি, বি, চক্রবর্ত্তী
গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৮ নং আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা


প্রীতি-উপহার
Presented by
Haridas
Indra

মধু-মিলন

এক

উন্মুক্ত কৃষ্ণকান্তের উইলের সম্মুখে স্তব্ধভাবে বসিয়া রমেশ কিসের চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। মোহিনী ডাকিল—রমেশ-দা!

রমেশ চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।—এই বুঝি তোমার বই পড়া হচ্ছে?

বই যে সে পড়িতেছিল না,—মোহিনী তাহা কি করিয়া ধরিয়া ফেলিল তাহা সে ভাবিয়া না পাইয়া, অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোহিনী হাসিতে হাসিতেই বলিল—ওঃ, কী আমার ভাবুক মানুষ গো! বইখানাকে উল্টো করে ধরে, পড়ার ভাণ করা হচ্ছিল।

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া বইখানার দিকে চাহিতেই দেখিল—সত্যই তো, নিতান্ত নির্বোধের মত সে বইখানা উল্টা করিয়া খুলিয়া রাখিয়া কী সব এলোমেলো ভাবনা ভাবিতে বসিয়াছে! আর এ-ত্রুটি ধরা পড়িল কিনা তাহারই কাছে, যাহার বিষয়টাই সে ভাবিতে বসিয়াছে। তবে কি মোহিনী তাহার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছে? সেইজন্যই

কি সে তাহাকে 'ভাবুক' বলিয়া উপহাস করিল? বইখানা সোজা করিয়া লইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিতেই, মোহিনী বলিল—আর বৃথা ঢাকবার চেষ্টা ক'রো না রমেশ দা! কিন্তু এমন তন্ময় ভাবনাটা কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছিল শুনতে পাব কি?

অনেক কষ্টে এবার একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া রমেশ বলিল—ভাবনা? ভাবনা আমি কি দুঃখে করতে যাব মোহিনী?

মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—তবে বইখানা উল্টো করে ধরে বুঝি পাশি পড়া হচ্ছিল?

যাহোক একটা কিছু উত্তর দিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবে—এই মনে করিয়াই রমেশ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিল, মোহিনী সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে,—কথাটা তাহার কাছ হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য সে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবে, শেষে অভিমান —হয়ত বা রাগ পর্য্যন্ত করিতেও ছাড়িবে না। কিন্তু কথাটা অন্য বিষয় লইয়া হইলে সে দ্বিধাহীন চিত্তে তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু এ যে তাহাকে লইয়াই! সুতরাং সে-কথা তো কিছুতেই মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করা চলে না! সে যে তাহাকে আজন্ম আপনার ভাইই দেখিয়া আসিতেছে। তাহার সেই অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-স্নেহের মূলে কি আজ হঠাৎ কুঠারাঘাত করা সম্ভব হইতে পারে?

রমেশ নীরবে চুপ করিয়া রহিল।......

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া মোহিনী গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল— তোমাকে আর জ্বালাতন করতে আসব না রমেশ-দা, আজকাল আর তুমি আমাকে আগেকার মত দেখ না।

রমেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। মোহিনী তো সত্য কথাই বলিয়াছে! সে তো আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রাতার পবিত্র চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না! ইদানীং কোথা হইতে সহসা একটা কাল পর্দ্দা উড়িয়া আসিয়া তাহার দৃষ্টির সে পবিত্রতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বুঝি বা অন্তরেরও!

মোহিনী কোন উত্তর না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। —রমেশ ডাকিল —মোহিনী!

তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। মোহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— কেন রমেশ-দা?

—আমাকে মাপ কর বোন্!

মোহিনীর গম্ভীর মুখে আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল, বলিল—কি জন্যে ক্ষমা চাচ্ছো?

অপরাধ যে কি এবং তাহার গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা কেবল রমেশই জানে। কিন্তু তাহা ত মোহিনীর কাছে স্বীকার করা চলে না! তাই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—অপরাধ করেছি বৈকি মোহিনী! তোমার ওই চির হাসিমাখা মুখখানায় বিষন্নতার ধুলো ছড়িয়ে দিয়েছি যে!

—ওঃ এই অপরাধ!

বলিয়া মোহিনী হাসিতে হাসিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

—তা যাই হোক,—তোমার পাগ্‌লা দাদার এই অদ্ভুত আচরণে কিছু মনে ক'রো না, মোহিনী!

বলিয়া রমেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার নিকটে বসিল।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—কিন্তু তুমি কি ভাবছিলে, তা আমাকে বলতে হবে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রসঙ্গই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রমেশ বড় বিপন্ন হইল। সহসা কি বলিয়া প্রগল্‌ভা বালিকাকে তাহার ভাবনার বিষয় বুঝাইয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

মোহিনী আবার অধীর হইয়া উঠিল। বলিল—বল্‌বে না, রমেশ-দা?

তথাপি রমেশ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

—তা হলে আমি উঠলাম। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।

বলিয়াই মোহিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা বলছি,—তুমি বোস।

মৃদু হাসিয়া মোহিনী আবার বসিয়া পড়িল। রমেশ তাহার দিকে চাহিয়া ধরা-গলায় বলিল—এই•• দু'দিন বাদে তোমার বিয়ে হবে··· কিন্তু—

—দুত্তোর! বলিয়া মোহিনী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশও সুযোগ বুঝিয়া বলিল—এই এখুনি আমার ভাবনার কথা জানবার জন্যে কত অভিমান কচ্ছিলে, আর যেই সে কথা বলতে সুরু করেছি, অমনি তোমার রাগ—ধন্যি মেয়ে যা হোক্!

—কে ধন্যি মেয়ে, রমেশ? বলিয়া হাসিতে হাসিতে শশধর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

—এই আমাদের মোহিনী, আবার কে?

বলিয়া রমেশ একবার মোহিনীর দিকে চাহিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। অভিমানে মোহিনীর চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একবার রমেশের দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শশধর চীৎকার করিয়া ডাকিল—মোহিনী ! ও মোহিনী ! শুনে যাও—

মোহিনী কিন্তু ফিরিল না—বাহিরে বারান্দায় বসিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া কেবলই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রমেশ শশধরের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা পাগলা মেয়ে যা-হোক ! —তা যাই হোক, যখন রাগিয়েছ ওকে, তখন যেমন করে পারো থামিয়ে এস-গে।

বলিয়া শশধর বাহিরের দিকে চাহিল।

মোহিনীর চাপা কান্নার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ কানে আসিয়া তাহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু রমেশ হাসিয়া বলিল—আমি এখন রাগ থামাতে গেলে ও আরও বেশী রেগে উঠবে, তার চাইতে...বরং তুমি গিয়ে চেষ্টা কর।

এই কথার অপেক্ষাটুকুই শশধর করিতেছিল। মোহিনীর শুষ্ক মুখ এবং এতটুকু চোখের জল যে তাহার হৃদয়ে কতখানি ব্যথা টানিয়া আনে, তা' কেবল সে-ই জানে, আর জানেন—যিনি তার অন্তর্যামী। রমেশের তা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার কথায় শশধর তাড়াতাড়ি বাহিরের বারান্দায় গিয়া হঠাৎ মোহিনীর মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। মোহিনী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—আবার তুমি শুধু আমার পেছনে লাগতে এসেছ, শশধর-দা ?

শশধর সান্ত্বনার স্বরে বলিল—না, মোহিনী, আমি তোমার পেছনে লাগতে আসিনি। গলাটা আমার বেজায় শুকিয়ে উঠেচে—যদি দয়া করে আমাকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দাও...

—আমি পারবো না। বাড়ীতে বুঝি আর চাকর-বাকর কেউ নাই? রোজ রোজ এমনিতর দাসীপণা করতে আমি আর পারবো না।

বলিয়া মোহিনী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। শশধর তাহার এলোমেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল—দূর পাগলা মেয়ে! অমন কথা কি মুখে আনে? আমরা কি তোমাকে সেই রকম ভাবে দেখি, না সেই ভাবে কখনও ফরমাস করি?

—তবে কিসের জোরে যখন-তখন এই সব ফরমাস করতে চাও—শুনি?

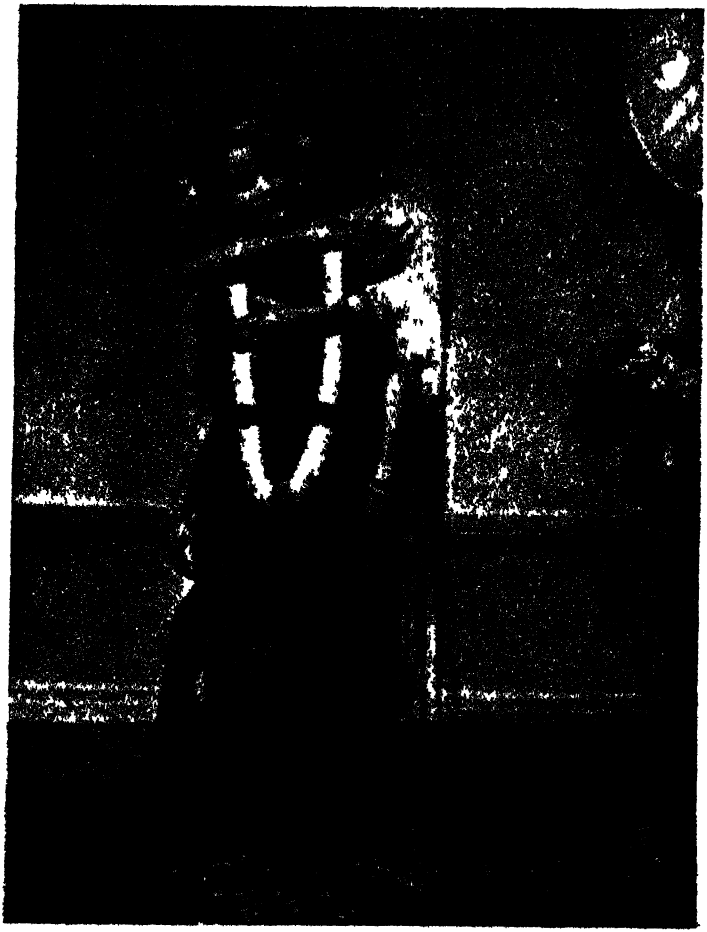
বলিয়া মোহিনী এবার এমন ভাবে শশধরের মুখের দিকে চাহিল যে, সে থতমত খাইয়া গেল, কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—ছোট বোনের উপর যে দাবী তারই জোরে—

বাধা দিয়া মোহিনী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা সব বোঝা গেছে। এখন তোমাকে আর বেশী বকতে হবে না—যাও।

শশধর কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। মেঝের উপর মোহিনীর পাশটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—তুমি যতই রাগ কর আর অভিমান কর—এক পেয়ালা চা তৈরী করে এনে না দিলে আমি এখান থেকে কিছুতেই উঠছি নে।

মোহিনী কোন উত্তর করিল না। খানিকক্ষণ গোঁ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত শশধরকে চায়ের প্রত্যাশায় তেমনি একই ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—বাবা বাবা…যাহোক তোমরা মানুষ বটে! যাও—ঘরে

মধু-মিলন—



সুধাননী ছুটিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া ফেলিল।

যাও—আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। আমি চা করে এনে দিচ্ছি।

—ঠিক দেবে তো?

—দোব দোব দোব—এই তিন সত্যি করলাম।

তারপর মোহিনী মৃদু হাসিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। শশধরও হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতরে গিয়া রমেশের পাশে আর-একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ পরে দুই পেয়ালা চা লইয়া মোহিনী ঘরে ঢুকিতেই রমেশ বলিয়া উঠিল—মোহিনীর যত রাগ দেখতে পাই কেবল আমারই ওপরে।

—বেশ, তাই। বলিয়া মোহিনী পেয়ালা দুটি টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়াই ছুটিয়া পলাইতে গেলে, রমেশ চায়ের পেয়ালাতে একবার চুমুক দিয়া ডাকিল—

—ও মোহিনী!···আরে রামচন্দ্র!···এ কী হ'য়েছে? চায়ে চিনি দাওনি মোটেই!

মোহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমি চা তৈরী করতে জানিনে, তা জেনেও কেন তোমরা আমার খোসামোদ করতে এস বাপু? এবার থেকে চিনির বদলে চায়ে লঙ্কা গুলে দেব।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মোহিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শশধর পেয়ালার চা-টুকু ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—অত রাগানোটা তোমার ভালো হ'ল না রমেশ।

—ওই এক আমোদ আর কি!

বলিয়া রমেশও পেয়ালার বাকী চা-টুকু শেষ করিয়া ফেলিল।

—তা হলেও অতটা বাড়াবাড়ি আমোদ ভাল নয়।

বলিয়া শশধর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

রমেশ কহিল—যাক্, এখন চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশধরও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

দুই

ইসলামপুরের জমিদার রামরতনবাবুর সংসারে রমেশ ব্যতীত অন্য কোন সন্তান না থাকায়, শশধর ও মোহিনী রমেশের ভ্রাতা এবং ভগ্নীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। মোহিনী—রামরতনবাবুর নায়েব, বলরাম ঘোষের একমাত্র কন্যা এবং শশধর তাঁহারই কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের পুত্র। শশধরের পিতা যখন অনাহারক্লিষ্ট দেহ লইয়া অন্তিম-শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে বলরামবাবুকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া শশধরের পিতা যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। নিজের মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। দূরসম্পর্কীয় এই আত্মীয়টির হস্তে তাঁহার জীবনের শেষ অবলম্বন নবম বর্ষীয় পুত্র শশধরকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মুক্তির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই হইতে শশধর বলরামবাবুর নিকটেই অপত্যস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল।

মোহিনীর বয়স যখন সাত বৎসর, সেই সময়ে বলরামবাবুর পত্নী-বিয়োগ হয়। স্বামিগত-প্রাণা পত্নীর জাজ্বল্যমান স্মৃতিপূর্ণ গৃহে কিছুতেই তাঁহার উদাস মনটাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে না পারিয়া তীব্র স্মৃতির দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া ইসলামপুরের জমিদারবাবুর নিকট চাকরি গ্রহণ করিয়া সেইখানেই শশধর এবং মোহিনীর সহিত বাস করিতে থাকেন।

প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলেও রামরতনবাবু, বলরামবাবুকে ভৃত্যের ন্যায় দেখিতেন না। তাঁহার অন্তরের সন্ত-উষ্ণ বিরাট ব্যথার গুরুত্ব বুঝিয়া, নিকট আত্মীয়ের ন্যায়ই তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিয়া শশধর ও মোহিনীর ভার নিজহস্তে তুলিয়া লইয়াছিলেন। বলরামবাবুও এই স্বজাতি-বৎসল জমিদারের অযাচিত করুণায় মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মন প্রাণ তাঁহার কার্য্যে ঢালিয়া দিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই।

জমিদারের একমাত্র পুত্র রমেশ, মোহিনীকে ঠিক ভগ্নীর ন্যায় দেখিয়া আসিলেও, সময়ে সময়ে তাহার মনটার ভিতরে যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইত। সে অনেক দিন হইতেই অন্তরে অন্তরে আপনাকে সংযত করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু হৃদয়-বৃত্তির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াও সে কিছুমাত্র জয়লাভ করিতে পারে নাই। বরং ঘৃতনিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায়ই তাহার অন্তর্নিহিত বাসনা-বহ্নি দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

শশধর রমেশের সহিত কলিকাতায় একসঙ্গে থাকিয়া একই কলেজে এক শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিত এবং তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়।

কিন্তু ভগবানের বোধ হয় এই প্রগাঢ় বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায় ছিল না। তাই তিনি মোহিনীকে তাহাদের মাঝখানে আনিয়া ব্যবধান-স্বরূপ দাঁড় করাইয়া দিলেন।

শশধর, মোহিনীকে আবাল্য ঠিক সহোদরা ভগ্নীর ন্যায়ই স্নেহ করিত—ভালবাসিত। মোহিনীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখিলে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া ভগ্নী-স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। মোহিনীর প্রতি এই বিপুল স্নেহাধিক্য দেখিয়া রমেশ মধ্যে মধ্যে তাহাকে উপহাস করিত—কিন্তু শশধর তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিত না—সরল হাস্য-তরঙ্গের মধ্যে বন্ধুর সকল উপহাসের তীব্রতা ডুবাইয়া দিত। তারপর যখন কিশোরী মোহিনীর কমনীয় দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের পরশ আসিল, তখন রমেশ শশধরের সে স্নেহাধিক্য আর কেবল সরল উপহাসের মধ্যেই ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার অজ্ঞাতে এ কটা হীন ঈর্ষ্যা ধীরে ধীরে হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

আবার মোহিনী যে কাহাকে অধিক ভালবাসিত, তাহা সে নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিত না।

তিন

বলরামবাবু ও রতনবাবু একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন—মোহিনী তো তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পড়্‌ল, কি বল হে?

—হুঁ…

বলিয়া বলরামবাবু নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় নীরবে অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে তুলিতে এক সময় কহিলেন—তা আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নাই। আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। ওদের দু'ভাই-বোনের ভার থেকে তো আপনি দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বলরামের চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

রামরতনবাবু কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন—তা বটে, কিন্তু তুমি বাপ, তোমার মতামতের দরকার আছে বৈকি।

একটা পুরাতন বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতির ছায়া বলরামবাবুর হৃদয়ে বর্ষার মেঘের মত ঘনাইয়া আসিল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—মোহিনীর বাপ আমি এককালে ছিলাম বটে রতন-দা, কিন্তু এখন আর নাই। এখন আপনিই সে-স্থান অধিকার ক'রে বসেছেন। আমি কেবল নামে বাপ।

রামরতনবাবু হাসিয়া বলিলেন—আমাকে অতটা বাড়িয়ে ব'লো না ভায়া। আমি যেটুকু নিজের কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি সেইটুকুমাত্রই করেছি, আর মানুষ মাত্রেরই সেটা করা স্বাভাবিক।

—কিন্তু আপনার এই কর্ত্তব্য যে আমাকে কত বড় দায় হ'তে মুক্তি দিয়েছে, তা আমি জানি আর জানেন আমার ভগবান্।

কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু তাঁহার চক্ষু বহিয়া আসনের উপর ঝরিয়া পড়িল।...রামরতনবাবু আধুনিক জমিদারদিগের ন্যায় আত্ম-প্রশংসা শুনিতে কোন দিনই ভালবাসিতেন না। বলিলেন—যাক এখন সে সব কথা। আমি তো মনে কর্‌ছি, আসচে মাঘ-ফাল্গুনেই কাজটা শেষ করে ফেলি। তোমার মত কি?

বলরামবাবু বলিলেন—আপনার যা ভাল বোধ হবে তাই করবেন—তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

হাসিয়া রতনবাবু বলিলেন—বেশ বেশ, তবে কি জান, আজ-কালকার দিনে পাত্র পাওয়া বড় দুষ্কর। হয়ত ঘরে দু-পয়সা আছে—কিন্তু পাত্রটি একেবারে অকাট মূর্খ; আবার হয়তো পাত্রটি খুব শিক্ষিত—কিন্তু তার চালচুলো কিছুই নাই—এইসব দেখে শুনে আমার মনে হয়, ওকে আর বাইরে বের করব না—আমাদের রমেশের সঙ্গেই সাত-পাকটা দিয়ে দেব। এখন তুমি যদি মত কর, তবে আয়োজন সুরু করে দিই।

দরিদ্র বলরামের কন্যা রামরতনবাবুর স্নেহ-যত্ন লাভ করিলেও সে যে পুত্র-বধূরূপে তাঁহার গৃহে স্থান পাইবে, তাহা বলরামবাবু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সুতরাং এ প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার হৃদয় যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা-রসে পূরিয়া উঠিল তাহা তিনি ভাষায় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ছল্‌ছল্ চক্ষে রামরতনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—রতন-দা, আমার আর মোহিনীর কি সে সৌভাগ্য হবে?

এই সময় রামরতনবাবুর স্ত্রী যোগমায়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলরামবাবুর শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন—বলিলেন—ঠাকুর-পো, সেটা কেবল তোমার একার সৌভাগ্য নয়, আমাদেরও। মা-টী যেরকম আমাদের মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে, তাতে ওকে পরের হাতে দিয়ে আমরাও চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবো না। ও এই বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি বাড়ীর শ্রী যেন ফিরে গিয়েছে—সকলের মুখে হাসি ফুটেছে।

বলরামবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—সেটা কেবল ওর গুণে নয় বৌদি! আপনাদের সংস্পর্শে এসে যে দানবও দেবত্ব পায়!...মোহিনী তো এতটুকু বালিকা!

স্বামীর ন্যায় যোগমায়াও আত্মপ্রশংসা শুনিতে ভালবাসিতেন না। বলিলেন—যাক্ সে সব কথা। আমাদের কথাবার্ত্তা তো এক রকম ঠিক হয়ে গেল। এখন ছেলে-মেয়ের মতটা একবার নেওয়া দরকার।

রতনবাবু পত্নীর দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—অবশ্য সে ভারটা তোমাকেই নিতে হবে।

—তার জন্যে তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। যত দূর দেখে আসছি, তাতে বোধ হয়, রমেশ এতে অসম্মত হবে না—মোহিনীর ভাবটা কিছু বুঝতে পারিনি।

বলরামবাবু বলিলেন—তার ভাব বোঝাবুঝির তো কোন দরকার নাই। যদি আপনাদের অনুগ্রহে এ কাজ হয়, তবে তো তার পরম সৌভাগ্য!

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন—ঠাকুর-পো, এখানে তুমি বড় একটা

কাঁচা কথা বলে। মেয়েমানুষ সৌভাগ্য-অসৌভাগ্য কিসে বিবেচনা করে তা তোমরা জান না।—জগতে যত কিছু আশ্চর্য্যের জিনিষ আছে, তাদের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ হচ্ছে আমাদের এই মেয়েমানুষের মনটা। তারা মনের সঙ্গে কি যে চায় আর কি যে না চায়, তা অতি বড় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বলতে পারেন না।

রামরতনবাবু হাসিয়া বলিলেন—সে নেহাৎ মিথ্যা নয় বলরাম! তার প্রমাণ স্বয়ং যিনি এ-কথা ব'লছেন তিনিই।

বলরামবাবু ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া প্রতিবাদের স্বরে বলিলেন—আপনার এ কথা মেনে নিতে পাল্লাম না, রতন-দা। বৌদির ওই সরল মুখখানির দিকে চাইলে একটা দু-বছরের ছেলে পর্য্যন্ত ওঁর মনের কথা টেনে বলতে পারে। অবশ্য এমন লোকও আছে, যাদের বাইরেটা এক-রকম আর ভেতরটা আর-এক রকম; কিন্তু বৌদির আমার ভেতর বাহির সব এক— ঠিক যেন গঙ্গার নির্ম্মল প্রবাহ।

যোগমায়া জানিতেন, তাঁহার এই বলরাম ঠাকুরপোটি তাঁহার প্রশংসা করিতে সুরু করিলে আর সহজে থামেন না—গুণের পর গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আদর্শ মানবী কি দেবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। তাই তিনি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য কাজের ছুতায় সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

—চার—

আল্‌নায় কাপড় গুছাইতে গুছাইতে যোগমায়া ডাকিলেন—মোহিনি!

বাহিরে রোয়াকে পা ঝুলাইয়া মোহিনী নিবিষ্টমনে একখানি নবপ্রকাশিত উপন্যাস পড়িতেছিল। যোগমায়ার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি পঠিত স্থানটায় একটা কাগজ দিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

—যাই, জ্যাঠাইমা!...

মোহিনী উপন্যাসখানি জানালার উপর তুলিয়া রাখিয়া যোগমায়ার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"আমাকে ডাক্‌ছিলে, জ্যাঠাইমা?"

—বোস, কথা আছে।

যোগমায়া একমনে কাপড়গুলি পাট করিয়া আল্‌নায় সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিলেন—রমেশের সঙ্গে তোর বিয়ের কথাবার্ত্তা তো এক রকম ঠিক হয়ে গেল...তা তোর এতে কিছু বলবার আছে কি?

লজ্জায় মোহিনীর মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে নীরবে আঁচলের কাপড়টায় পাক দিতে লাগিল।

যোগমায়া তাহার লজ্জারক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন—এতে লজ্জার কি আছে রে! যে জিনিষটার সঙ্গে আজীবন সম্বন্ধ, সেটা একটু বুঝে-সুঝে করা ভাল নয় কি?

এবার মোহিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল—তোমাদের চেয়ে আমি তো নিজের ভালমন্দ বেশী বুঝতে পারব না, জ্যাঠাইমা!

মুখ ছাড়িয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়া

বলিলেন—তা তো বটেই। তবে কিনা, এখন তুই যেটের কোলে একটু বড় হয়েছিস—নিজের ভালমন্দ বিবেচনা করবার ক্ষমতাও একটু হয়েছে। সেইজন্যেই তোর মতটা জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মোহিনী ধীরকণ্ঠে বলিল—হাজার বড় হলেও আমি তোমাদের কাছে ছোট মেয়েটির মতই আছি জ্যাঠাইমা···চিরদিনই তাই থাকবো।

—যাক্, তা হলে তো তোর এতে কোন আপত্তি নেই?

বলিয়া যোগমায়া উত্তরের অপেক্ষায় মোহিনীর মুখের দিকে চাহিলেন।

মোহিনী নতমুখেই উত্তর করিল—না।

যোগমায়া স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—বাস্···এইবার আমি নিশ্চিন্তমনে সব যোগাড়-যন্ত্র করতে পারব।

যোগমায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মোহিনী আবার পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়ার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—জ্যাঠাইমা, আমার খাবার পাঠিয়ে দাও—বড্ড খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে তা এতক্ষণ বলিস নি কেন? আচ্ছা মেয়ে যাহোক তুই। বলিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া গেলেন।

বৈকালে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বারান্দাটা পার হইয়া যাইতেই শশধরের খোলা ঘরের দিকে মোহিনীর দৃষ্টি পড়িল। তেমন সময় শশধরের ঘর কোন দিনই খোলা থাকিত না। বেলা পাঁচটার পরেই সে দরজায় তালা বন্ধ করিয়া রমেশের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া যাইত। সুতরাং সেদিন তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মোহিনী বড়ই বিস্মিত হইল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া ভিতর দিকে উঁকি মারিয়া ডাকিল—শশধর-দা!

শশধরের ঠিক মাথা ধরিয়াছিল কিনা বলা যায় না—তবে সে মাথা ধরার অজুহাতেই রমেশকে একাকী বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া একলা চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল।

মোহিনীর ডাক শুনিয়া মাথাটা একটু উঁচু করিয়া বালিশের উপর তুলিয়া, শশধর কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল—কি বলছ?

—এমন সময়ে শুয়ে আছ যে? শরীর খারাপ বোধ কচ্ছ নাকি?

মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া শশধরের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

দুই হাত দিয়া মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া শশধর বলিল—না, শরীর এমন খারাপ করেনি—তবে মাথাটা একটুখানি ধরেছে।

শশধরের মাথা টিপিয়া ধরিবার ভাব দেখিয়া মোহিনী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—খুব কামড়াচ্ছে নাকি?

একটুখানি যন্ত্রণাসূচক অস্পষ্ট শব্দ করিয়া শশধর বলিল—হ্যাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বৈকি।

—একটুখানি 'ওডিকোলন' দিয়ে দেব?

—তা দেবে দাও।

মোহিনী তাড়াতাড়ি ওডিকোলনের সঙ্গে কয়েকটা জল মিশাইয়া একটা ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া শশধরের কপালে লাগাইয়া দিল।

অজ্ঞাতে শশধরের মুখ দিয়া একটা আরামসূচক শব্দ বাহির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে মোহিনীর ভিজা হাতখানি কপালের উপর চাপিয়া ধরিল।

মোহিনী বলিল—ছেড়ে দাও, একখানা পাখা নিয়ে এসে মাথায় আস্তে আস্তে বাতাস করি।

—বাতাস আর করতে হবে না মোহিনি। তোমার হাতটা বেশ ঠাণ্ডা—বড্ড আরাম পাচ্ছি।

বলিয়া শশধর মোহিনীর হাতটা আরও জোরে কপালের উপর চাপিয়া ধরিল।

মৃদু হাসিয়া মোহিনী বলিল—ওডিকোলন নেড়েছি কিনা, তাই হাতটা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। তা পাখাখানা নিয়ে এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—হাতটা ছেড়ে দাও।

শশধর ছাড়িল না। বলিল—না না, বাতাস আর করতে হবে না—এতেই আমার মাথা বেশ ছেড়ে আসছে।

—ছাই ছেড়ে আসছে। তোমার শুধু চালাকী!

বলিয়া মোহিনী জোর করিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া চোখের পলকে উঠিয়া পড়িল, তারপর পাখা লইয়া আসিয়া আবার তেমনি বসিল।

শশধর আবার তাহার হাতটা নিজের কপালের উপরে চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুজিল।

মোহিনী নীরবে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট কেহই কোন কথা বলিল না। তারপর শশধর পাশ ফিরিয়া ডাকিল—মোহিনি!

—কেন, মাথাটা খুব বেশী কামড়াচ্ছে নাকি?

মোহিনী মাথা টিপিয়া দিবার জন্য হাত টানিয়া লইল।

—না না, মাথা কামড়ায়নি।

—তবে কি হচ্ছে?

—বুকটা বড় ধড়ফড় কচ্ছে।

শশধর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোহিনীর হাতখানি আবার টানিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

মোহিনী ভীতভাবে বলিল—জ্যাঠাইমাকে বলবো নাকি ?

—না না, এতো সামান্ত ব্যাপার, এ-সব কথা আর জ্যাঠাইমাকে বলতে হবে না।—আমার সে রকম কিছু হয়নি। বরং তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও তাহলেই সেরে যাবে।

শশধর মোহিনীর হাতটা ছাড়িয়া দিল।

মোহিনী পাখাখানি রাখিয়া তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—তোমারতো আগে এমন করে বুক ধড়ফড় করত না—তবে আজ হঠাৎ এমন হল কেন, শশধর-দা ?

—কি জানি…

বলিয়া শশধর পুনরায় একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল

—কিন্তু, যার জন্তেই হোক্ না কেন, কাল তুমি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করে নেবে। বেদনা তো অন্য কোনো জায়গায় নয়—বুকে, এম্‌নি এম্‌নি ফেলে রাখা ঠিক হবে না। এখানে যদি ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে কল্‌কাতায় গিয়ে দেখাবে—বুঝলে ?

শশধর চোখ বুজিয়া বলিল—আচ্ছা।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ।

শশধর বলিল—মোহিনি, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম—

—কী কথা ?

—একটা খুব দরকারী কথা। কিন্তু আমি চাই সত্যি উত্তর,—দেবে ?

মোহিনী অপলক-দৃষ্টে কিছুক্ষণ শশধরের পানে তাকাইয়া কহিল—আমি তো মিথ্যে কথা বলি না, শশধর-দা ?…কিন্তু তোমার কী কথা, বলো ?

মোহিনীর একখানি হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া শশধর অতি ধীর কুণ্ঠাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আমাকে ভালবাস মোহি'নি ?—সত্যি বলো।

মোহিনীর মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল, বলিল—পাগল হ'য়েচ ? ভালবাসি না—একটুও না।

আপনার বুকের উপর ন্যস্ত মোহিনীর হাতটার উপর জোরে একটা চাপ দিয়া শশধর বলিল—না না, সত্যি উত্তর দাও মোহিনী, এ-কথা হাসির কথা নয়।

মোহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কৌতুকের সুরে বলিল— সত্যি উত্তরই তো দিলাম গো ! মোহিনী মিথ্যে কথা বলে কখনো ?

—বেশ, তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না আমি। বলিয়া শশধর কতকটা রুষ্টভাবেই হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—বাবা-বাবা ! পুরুষের রাগটুকু তো কম নয় ! বাসি গো বাসি—খু-ব ভালবাসি—ভয়ানক ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি !

শশধর মোহিনীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আমার গা ছুঁয়ে বলছ ?

মৃদুহাস্য-রঞ্জিত মুখে মোহিনী উত্তর করিল—হ্যাঁ।

— আচ্ছা আমার ওপর এমনি ভালবাসা কি চিরকাল তুমি রাখতে পারবে?

ঘাড় বাঁকাইয়া মোহিনী বলিল—খুব পারবো, আলবাৎ পারবো।

—রমেশের সঙ্গে বিয়ে হলেও?

—যাও, জানিনে।... খালি খালি যত সব বাজে কথা!

বলিয়া মোহিনী লজ্জায় মুখখানি রাঙা করিয়া মাথা হেঁট করিল।

শশধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ বিয়েতে তোমার মত আছে তো, মোহিনি?

মোহিনী কোন উত্তর দিল না—একই ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

শশধর তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাতে মৃদু চাপ দিতে দিতে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বল মোহিনি, তোমার মত আছে? এ বিয়েতে তুমি সুখী হবে? আমার কাছে লজ্জা ক'রো না মোহিনী! এ বাড়ীর মধ্যে আমি তোমার জন্য যতটা ভাবি, এতটা বোধ হয় আর কেউ ভাবে না।

মোহিনী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—তা আমি জানি শশধর-দা।

—তবে আমার কাছে লজ্জা ক'চ্ছ কেন?

—না, লজ্জা তো করিনি?

—যদি লজ্জা করনি, তবে বল তোমার এ বিয়েতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না?

—তাতে কি করবে, শশধর-দা?

মোহিনীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

দৃঢ়কণ্ঠে শশধর উত্তর করিল—যদি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকে, তা হলে কখনই এ-বিয়ে হতে দেব না আমি, - কিছুতেই না।

মোহিনীর চক্ষু দুইটী সজল হইয়া আসিল। বলিল—কিন্তু জ্যাঠাইমার মনে কতখানি কষ্ট হবে বল দেখি?

একটা অজ্ঞাত পুলক-প্রবাহে শশধরের সর্ব্ব শরীর সহসা কণ্টকিত হইয়া উঠিল।...

তাহা হইলে কি মোহিনীর এ বিবাহে আন্তরিক ইচ্ছা নাই? কেবল জ্যাঠাইমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই এইটুকু প্রতিবাদ না করিয়া বুকের দারুণ বেদনা মুখের হাসি দিয়া ঢাকিয়া রমেশকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে সে!

না-না, তা হইবে না। সে বাঁচিয়া থাকিতে মোহিনীকে এত বড় একটা দুঃসহ দুঃখের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সে কিছুতেই দিবে না। তাহার প্রাণের বিনিময়েও এ বিপদ্ হইতে মোহিনীকে রক্ষা করিতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

শশধরকে চিন্তিত দেখিয়া মোহিনী ধরা গলায় ডাকিল—শশধর দা!

চিন্তিত মনেই শশধর উত্তর দিল—কেন মোহিনি!

—তুমি এর জন্যে মনে কোন কষ্ট ক'রো না ভাই! অদৃষ্ট ছাড়া ত' পথ নাই!

শশধর তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর আবার চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল—না না মোহিনি, তা হবে না। যে বিয়েতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা নাই, সে বিয়ে আমি প্রাণ থাকতে কখনই হ'তে

দেব না। আমি তো তোমাকে সে-চোখে কোনদিন দেখি নি! তুমি যে আমার বুকের কলিজা, আমার দেহের শোণিত!

মোহিনী বুঝিতে পারিল, কথাটা সে শশধরের নিকট বলিয়া ফেলিয়া ভাল কাজ করে নাই। একটা আকস্মিক অনর্থপাতের আশঙ্কায় সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

শশধর তাহাকে যেরূপ অন্তরের সহিত ভালবাসে, তাহাতে সে যে তাহার এই নিদারুণ অনিচ্ছা জানিয়াও, এ-বিবাহ ঘটিতে দিবে, তাহা তো কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত ইহা লইয়া বাড়ীর মধ্যে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইবে। পিতার উন্নত মস্তক লজ্জায় ও ঘৃণায় রামরতনবাবুর নিকট চিরকালের জন্য অবনত হইবে। ছিঃ—ছিঃ—কি লজ্জার বিষয়! কেন সে সকল দিক্ না ভাবিয়া ফস্ করিয়া শশধরের নিকট কথাটা বলিয়া ফেলিল! আত্ম-ধিক্কারে মোহিনীর দুই চক্ষু বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। শশধর তাহা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিল। সে মনে করিল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রমেশকে বিবাহ করিতে হইবে বলিয়াই মোহিনী মনের দুঃখে তাহার কাছে কাঁদিয়া ফেলিল।

শশধর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কোঁচার কাপড়ে তাহার চোখের জল সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল,—ছিঃ মোহিনি, কেঁদো না! যেমন করে পারি আমি তোমার এ-বিয়ে ভেঙ্গে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মোহিনি, তোমার কোন ভয় নাই।

বিপরীত সান্ত্বনা বাক্যে মোহিনীর চোখের জল থামিল না—বরং আরও প্রবলবেগে শশধরের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সে দুই হাত দিয়া শশধরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—শশধর দা!

তাহার সে ব্যথা-কাতর মুখখানি দেখিয়া শশধরের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল। বলিল—কেন মোহিনি?

—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি শশধর-দা, এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোন কথা তুমি ব'লো না।···মোহিনীর কণ্ঠস্বরে তাহার হৃদয়ের আকুল আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হইল!

শশধর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু, কেন? ব'ল্‌বো না কেন?

—না না, আমার মাথার দিব্যি, তুমি আমার সম্বন্ধে কারুর কাছে কোন কথা বলতে পাবে না।

কিন্তু কাউকে কিছু না বলে, এ-বিয়ে কেমন করে ভাঙ্‌ব মোহিনি?

মোহিনী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল—ভাঙ্‌তে হবে না তোমাকে।

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শশধর মোহিনীর শিশির-সিক্ত স্থল-পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিল—ভাঙ্‌তে হবে না?

—না, আমি রমেশ-দাকেই বিয়ে করব।

শশধর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, পাগল! সামান্য লজ্জার জন্যে, এত বড় একটা জীবনব্যাপী কষ্টের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে' চিরকাল দুঃখ পাওয়াটাই কি ভাল মোহিনি?

চোখের জল মুছিয়া মোহিনী ভাল হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—হ্যাঁ শশধর-দা, আমার তাই-ই ভাল। বাবা আর জ্যাঠাইমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি সুখী হতে চাইনে। সে সুখ হবে আমার দুঃখেরই নামান্তর

—এতে তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া কেমন করে হবে, মোহিনি? তাঁরা তো জানেনই যে, এ বিয়েতে তোমার ইচ্ছা নাই!

—তা জানুন, তবু তাঁদের ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাইনে। তা আমি পারবো না কখনো।

—কিন্তু এর ফল কি হবে জান?

—জানি।

—তবে জেনে-শুনেও এমন কাজ করাটা কি ভাল হবে? আমি অবিশ্যি তোমার দিক্ দিয়েই বলছি।

—হবে, খুব ভাল হবে শশধর-দা, আমিও আমার দিক্‌টা ভেবেছি।

শশধর রাগিয়া উঠিল। মোহিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—বেশ।

—এমন সময় বাহির হইতে যোগমায়া ডাকলেন—মোহিনি!

মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া উত্তর দিল—কেন জ্যাঠাইমা, কি বলছো?—

—এমন অসময়ে, শশধরের ঘরে বসে কি কচ্ছিস?

যোগমায়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শশধর তাড়াতাড়ি মাথা টিপিয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল।

যোগমায়া তাহা দেখিতে পাইয়া শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—অবেলায় শুয়ে পড়েছিস্ কেন-রে, শশধর?

মোহিনী নতমুখে বলিল—মাথা ধরেছে। আমি এতক্ষণ ওডিকোলন দিয়ে দিচ্ছিলাম।

—মাথা ধরেছে?

যোগমায়া শশধরের শয্যার নিকট আসিয়া তাহার কপালে হাত দিলেন।

শশধর একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

যোগমায়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার ঘরে, আল্‌মারীতে স্মেলিং-সল্টের শিশিটা আছে, নিয়ে আয় তো মোহিনি।

মোহিনী তাড়াতাড়ি স্মেলিং-সল্টের শিশিটা আনিয়া যোগমায়ার হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগমায়া শিশির কর্ক খুলিয়া শশধরের নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন—এই-টে বার কতক শোঁক্ দেখি, অনেকটা আরাম পাবি।

শশধর অতি কষ্টে বার-কতক তাহার আঘ্রাণ লইয়া বলিল—আমার মাথায় একটু হাওয়া কর জ্যাঠাইমা!

নিকটেই পাখা পড়িয়াছিল। যোগমায়া তাহা তুলিয়া লইয়া মাথায় আস্তে-আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন।

শশধর ক্লান্তভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

—পাঁচ—

মেসে গিয়া রমেশ নিজের বিবাহের কথাটা এরূপ শাখা-প্রশাখা সহকারে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, তাহারা নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে ও থিয়েটার যাত্রায় মাতিয়া উঠিবার উৎসাহে দিনকতক মেসের ভিতরে মহা হৈ-চৈ ব্যাপার বাধাইয়া দিল। ঝি, চাকর ও ঠাকুর পর্য্যন্ত সুযোগ বুঝিয়া রমেশের কাছ হইতে টাকাটা-সিকিটা আদায় করিতে ছাড়িল না এবং শুভ-বিবাহের পরে অন্ততঃ এক জোড়া করিয়া মটকার চাদর না লইয়া যে ইসলামপুর হইতে ফিরিবে না, তাহাও বাবুকে আব্দারের সহিত বারম্বার বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

ব্যতিক্রম দেখা গেল—শশধরের আচরণে। এবার বাড়ী হইতে ফিরিয়া অবধি রমেশ মেসে শশধরের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিত না ও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিত না। অবশ্য তাহার পক্ষ হইতে ইহার যুক্তিযুক্ত কারণ যে যথেষ্ট ছিল না এমন নয়। তাহার নিকট এখন আসন্ন-বিবাহের কথাটা যতটা মধুর বলিয়া বোধ হইত ততটা অন্য কোন প্রসঙ্গই বোধ হইত না। কিন্তু শশধর এই মধুর প্রসঙ্গ-টাকেই এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত ও পাঁচজনকে এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ও জল্পনা-কল্পনা করিতে দেখিলেই সেখান হইতে সরিয়া যাইত। অন্য কাহারও চোখে এই উপেক্ষাটুকু ধরা না পড়িলেও রমেশের চোখে ধরা পড়িল। সে ভাবিল, শশধর তাহার এই শুভ-মিলনে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছে ও সেইজন্যই সে ইহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রাণ ধরিয়া

শুনিতে পারিতেছে না। তাই রমেশও ইচ্ছা করিয়াই যতদূর সম্ভব তাহার সাহচর্য্য এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সেদিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া শশধর হঠাৎ রমেশকে বলিল —চলো হে, রমেশ, ইডেন্ গার্ডেন দিয়ে একটুখানি বেড়িয়ে আসা যাক্। যাবে?

রমেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজকে তো যেতে পারব না!

শশধর বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন যেতে পারবে না? রোজ বিকেলে তো ভজন, বিজয়, এদের সঙ্গে বেড়াতে যাও—আজ না হয় আমার সঙ্গেই একটু গেলে, তাতে এমন ক্ষতিটা কি হবে, শুনি?

—আজ আমি থিয়েটারে যাব।

—থিয়েটারে?

—হ্যাঁ, থিয়েটারে।

—এই তো শনি-রবি দু'দিন দেখলে···সাধ মেটেনি—আবার যাবে? কিন্তু এতে পড়াশুনোর কতটা ক্ষতি হচ্ছে, তা বুঝতে পাচ্ছ?

—দরকার নেই বুঝে। দু'দিন আমোদ-প্রমোদ করে যদি পড়াশুনোর ক্ষতি হয় তো হোক্—তার জন্যে আমি ভাবিনে।

রমেশের কথা শুনিয়া শশধর বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। এই রমেশই না আগে চব্বিশ ঘণ্টা বই লইয়া বসিয়া থাকিত! থিয়েটার বায়স্কোপের নাম শুনিলে জলিয়া উঠিত!

শশধরকে চিন্তিত দেখিয়া রমেশ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাবছো?

—ভাবছি তুমি ছিলে কি, আর এখন হ'য়ে যাচ্ছ কি !

মৃদু-হাস্যরঞ্জিত স্বরে রমেশ উত্তর করিল—ছিলাম তোমার মত নীরস তরুবর, আর হয়েছি এখন সরস প্রেমিক—নবীন নটবর !

আপন রসিকতায় আপনি মুগ্ধ হইয়া রমেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শশধর বিরক্ত হইয়া বলিল—অধঃপতনের পথে যখন মানুষ নামতে সুরু করে, তখন ত'র এমনি ভাবেই বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেতে থাকে।...

হাসি থামাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু এতে আমার অধঃপতনের পথ কোন দিকে দেখতে পেলে, শশধর ?

শশধর উত্তর দিল—সব দিকে। যে মানুষ বই ছাড়া এক ঘণ্টাও বাজে সময় নষ্ট করত না, —থিয়েটার-বায়োস্কোপের নামে জলে' উঠ্‌তো, সেই মানুষই যদি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে যাত্রা-থিয়েটার-বায়স্কোপে যেতে বদ্ ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়ায়, তবে তার অধঃপতন ছাড়া আর কি ভাব্‌বো ? ..আমিও তো ক'ল্‌কাতাতেই থাকি রমেশ, কোথায় কি হ'চ্ছে না হচ্ছে,—সে খবর যে একদম জানিনে তা তো নয়।

রমেশ রীতিমত রাগিয়া উঠিল—

দেখ শশধর, তোমার অতটা হিংসে ভালো নয়। আমি যদি অধঃপাতেই গিয়ে থাকি, নিজের পয়সায় গিয়েছি—তার জন্যে কারুরই মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করে না। পরের তরে এতখানি মাথা নাই বা ঘামালে শশধর ! মিছি-মিছি কষ্ট তো ?

—তুমি দরকার বোধ না করলেও আমি করি রমেশ, কারণ আমি

তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত। নুন্ যার খেতে হয়, তার গুণও গাইতে হয় বুঝলে ?

ইহার উত্তরে রমেশ কিছু বলিতে পারিল না,—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কোটের বোতাম নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল।

শশধর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল—আচ্ছা, আজ থিয়েটারে যাচ্ছো যাও, তবে অবসর বুঝে একদিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রো—অনেক কথা আছে।

শশধর সেদিন আর বেড়াইতে গেল না। রমেশ সবান্ধবে থিয়েটার দেখিতে বাহির হইয়া গেলে, সে নিজের ঘরে গিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া মোহিনীকে চিঠি লিখিতে বসিল।

—ছয়—

অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া দুই তিন খানি চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া অবশেষে শশধর একখানি চিঠি সম্পূর্ণ করিল :—

"মোহিনি, এবার বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিয়া তোমার কোন চিঠিপত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। পত্র পাঠ তোমার ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। আমি তোমার পত্রের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আজ তোমাকে গোটাকতক বিশেষ দরকারী কথা লিখিব। তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত সব পড়িয়া বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে। এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিও না। বিপদ্‌কালে ভগ্নী, ভ্রাতার

নিকট যেরূপ ভাবে সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপ ভাবে আমার নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া লিখিবে।

"আচ্ছা, তুমি কি রমেশকে সত্য-সত্যই ভালবাস? অবশ্য আমি ভ্রাতা-ভগ্নীর স্নেহ-ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসার কথা। তুমি কি তাহাকে সানন্দ-চিত্তে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে? রমেশ এখানে আসিয়া অবধি তাহার বিবাহের কথা লইয়া ছেলেদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া দিয়াছে। মনের আনন্দে আর পড়াশুনায় আদৌ মন দিতে পারিতেছে না—যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সময় কাটাইয়া দিতেছে। এক-কথায় বলিতে গেলে সে তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যে বিবাহে বাধা দেওয়াটাও খুবই অন্যায় হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মোহিনী, তোমার যদি সত্য-সত্যই ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে আমাকে শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়াও এ-অন্যায় করিতে হইবে। তুমি তো জান, এতটুকু বেলা হইতে তোমাকে আমি কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি! তোমার যাহাতে এতটুকু কষ্ট হয়, তাহা আমি প্রাণ থাকিতে কখনই হইতে দিব না। ইহাতে যদি আমাকে সর্ব্বস্ব হারাইতে হয় তাহাতেও প্রস্তুত। এই আমার পণ, মোহিনী। যদি সত্য-সত্যই রমেশকে বিবাহ করিতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে সব দিকেই ভাল হয়। তোমার পত্র পাইলেই আমি হৃষ্টচিত্তে তোমার বিবাহের আয়োজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। আর যদি ইহাতে মত না থাকে, তাহা হইলে তাহাও জানাইবে। কদাচ লজ্জা করিও না। তোমার এখন জ্ঞান

হইয়াছে। যাহার উপর তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবন নির্ভর করিতেছে তাহাতে লুকোচুরি খেলা খেলিও না। এই তোমার কাছে আমার-একান্ত অনুরোধ। আর একটা মজার কথা শুনিবে? রমেশ আজকাল মনে করে আমি তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, সেইজন্য সে এখানে আসিয়া অবধি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বলে না।…আচ্ছা, অনেক লেখা হইয়া গেছে, আজ আর না। আমরা ভাল আছি। ইতি—

তোমার—শশধর-দা—"

শশধর চিঠিখানি শেষ করিয়া খামে পুরিয়া ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্য মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—পথে পথে গ্যাসের আলো জ্বালা হইতেছিল। শশধর খামখানি হাতে করিয়া অন্যমনস্কভাবে যোড়াসাঁকোর মোড় পার হইয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। কিন্তু রাস্তার মধ্যে যে পাঁচ সাতটা ডাক-বাক্স পড়িয়া রহিল তাহা সে আদৌ লক্ষ্য করিল না। মিনিট দশ-পনের পরে হঠাৎ—"চাই বেল-ফুলের মালা"—বিকট হাঁকে চমকিয়া, পূর্ব্বদিকের ফুটপাতের উপর থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নিকটেই একটা ডাক-বাক্স মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বেল-ফুলের ফেরিওয়ালাটা তাহারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া "চাই বেল-ফুল" হাঁকিতেছে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ডাক-বাক্সের মধ্যে চিঠিখানি ফেলিয়া দিল। ফেরিওয়ালা তখনো ডাকিতেছে—এবং এই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পাশের দোতলা বাড়ী হইতে বামা-কণ্ঠের সঙ্গীত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল

একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শশধর উপরের দিকে চাহিয়াই, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিল। ঐ যে জানালার ধারে পিছন ফিরিয়া একজন যুবক বসিয়া আছে, ও রমেশ নয় তো? জামা চাদর সবই তো তাহার মত মনে হইতেছে! তবে কি রমেশ থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিবার ছল করিয়া এই সব কু-স্থানে আসিয়া সময় কাটায়? ইহারই মধ্যে তাহার কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে! শশধর যুবকটিকে ভাল করিয়া চিনিবার জন্য গলির ধারে আরো একটু সরিয়া আসিল।...কিন্তু এ যে সত্যই রমেশ!

—সাত—

মোহিনী ইজি-চেয়ারের উপর কাৎ হইয়া বসিয়া কি একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল।

যোগমায়া কি একটা আবশ্যকে সেইদিক দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি মোহিনীর দিকে পড়িতেই তিনি বলিলেন—ওরে মোহিনী, তোর একখানা চিঠি আছে।

মোহিনী চমকিয়া বলিল—চিঠি?

—হ্যাঁ, চিঠি। আমার ঘরে কুলুঙ্গীর উপর আছে।

যোগমায়া আপন কাজে চলিয়া গেলেন।

মোহিনী ভাবিল—তাহাকে চিঠি লিখিল কে? শশধর-দা, না রমেশ-দা? রমেশ-দা তো লজ্জায় তাহাকে চিঠি লিখিতে পারিবে না। বোধ

হয় শশধর-দাই লিখিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যোগমায়ার ঘর হইতে চিঠিখানি লইয়া রমেশের ঘরে গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। তার পর খাটের উপর উঠিয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার সুন্দর মুখখানি কখনও হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, আবার কখনও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

পড়া শেষ হইলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চিঠিখানি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর রমেশের টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া চিঠির কাগজ বাহির করিয়া উত্তর লিখিতে বসিল। কিন্তু "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়" লিখিয়া আর কলম সরিল না। মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কি বলিয়া সে শশধরের পত্রের উত্তর দিবে? শশধর বার বার করিয়া সকল কথা তাহাকে খুলিয়া লিখিতে বলিয়াছে—কিন্তু তাহা কি সম্ভবপর? একবার বলিয়া তো দেখিয়াছে। তাহাতে তো কোনই ফল হয় নাই। বরং তাহাকেই লজ্জায় পড়িতে হইয়াছে। না—না, আর তাহার কাছে অন্তরের কথা প্রকাশ করা হইবে না। রমেশ-দাকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে বলিয়া লিখিয়া দিবে—কিন্তু মোহিনীর হৃদয় আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে সে কি সুখী হইবে? বিদ্রোহী-হৃদয় জোর গলায় বলিয়া উঠিল—না—না—তাহা কিছুতেই হইবে না। যাহাকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছে—

ঠিক সেই সময় বাহির হইতে যোগমায়া দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিলেন—ওরে মোহিনী, ঘরে খিল দিয়ে একলাটী চুপ করে বসে কী করছিস্?

মোহিনী ধড়মড় করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দোরের খিল খুলিয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

যোগমায়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কা-বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর কি কোন অসুখ করেছে, মোহিনী?

মোহিনী থতমত খাইয়া উত্তর দিল—মাথাটা বড্ড ধরেছে।

যোগমায়া তাড়াতাড়ি তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন—আচ্ছা চাপা মেয়ে তুই মা! মাথা ধরেছে তা এতক্ষণ আমাকে বলতে কি হয়েছিল?

মোহিনী মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল—আপনিই সেরে যাবে বলে চুপ করে শুয়েছিলাম।

—যত সব ছেলেমানুষি কাণ্ড—যা, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শুয়ে থাক্‌গে। তারপর মাথা ছাড়লে আমার কাছে উঠে আসিস্।

যোগমায়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোহিনীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—বোঠাকুরাণীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় খিল দিয়া আসিয়া শশধরকে পত্র লিখিতে বসিল। শশধর লিখিয়াছে—বিপৎকালে ভগ্নী ভ্রাতার নিকট যেরূপভাবে সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করে, তুমিও সেইরূপভাবে আমার নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া লিখিবে। শশধর তাহাকে ভগ্নীর ন্যায় দেখে ও সেই দাবীতেই সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রমেশকে তাহার বিবাহ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না! হায়রে নিষ্ঠুর পুরুষ! তাহার অন্তরের বাসনা আজও কি সে জানিতে পারে নাই! কেবলমাত্র ভগ্নী বলিয়াই তাহাকে জানিয়া আসিয়াছে! এই যে পলে পলে তাহার কোমল নারী-হৃদয় তাহারই চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি সে

একবারও দেখিতে পায় না? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নীরস পাঠ্য-পুস্তকগুলি কি মানুষের এমনি করিয়াই দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়া লয়? মোহিনীর অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটি গভীর যাতনাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস উঠিল। শশধর তাহাকে চায় না—পোড়ারমুখী মোহিনীই কেবল তাহাকে চায়! ক্ষোভে, অপমানে ও রোষে মোহিনীর চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কলমটা ধরিয়া তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে লিখিয়া ফেলিল—

"শশধর-দা,

তোমার পত্র পেলাম। আমি সত্যি কথাই লিখ্‌ছি,—রমেশ-দাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নাই। ইতি—

মোহিনী।"

তারপর চিঠিখানি একজন ঝিকে ডাকিয়া তখনই ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া দিল। তারপর আবার দরজায় খিল আঁটিয়া, বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

—আট—

বড় আশা করিয়া, দুরু-দুরু বক্ষে শশধর মোহিনীর চিঠিখানি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া পড়িল। কিন্তু সেই অতি-ক্ষুদ্র পত্রখানি পড়িয়া বিস্ময়ে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিশ্চয়ই তাহার হৃদয় রমেশকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে মোহিনীকে আবার একখানি পত্র লিখিতে বসিল। তাহাতে লিখিল:—

"মোহিনী,

তোমার পত্র পাইয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে,তুমি রমেশকেই বিবাহ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়াছ—কিন্তু ইহা প্রকৃতই তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি না, তা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি কেবলমাত্র জ্যাঠামশায়-জ্যাঠাইমা ও তোমার বাবাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এ বিবাহের জন্য তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। যাহার সহিত চির-জীবনের জন্য তোমার হৃদয়-বিনিময় হইবে, তাহাকে কাহারও মন যোগাইবার জন্য বিবাহ করাটা যে কতদূর অমঙ্গল, তাহা বোধ হয় তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী বালিকাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক, আর একবার বেশ নিবিষ্টভাবে ভাবিয়া আমার এই পত্রের উত্তর দিও। হয়ত তুমি আমার এই বাড়াবাড়ি দেখিয়া মনে মনে হাসিবে—বলিবে, আমার বিবাহের জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন? কিন্তু মোহিনী, তুমি কি জান না যে, আমি তোমায় কিরূপ ভালবাসি! তোমার ওই সদা-হাস্যময় প্রফুল্ল মুখখানিতে যদি কোনো দিন বিষাদের কালিমা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার প্রাণে কতদূর বাজিবে! যাক্,এখন আর মনোভাব প্রকাশ করিবার সময় নাই। যদি এতদিনকার সাহচর্য্যেও আমার ভালবাসার মূল্য বুঝিয়া না থাক,তবে আর আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতে ইচ্ছা করি না। যত শীঘ্র পার, পত্রের উত্তর দিও। রমেশের সম্বন্ধে একটা নূতন খবর শুনিবে কি? কিন্তু না, তাহা এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই। যাহাকে তুমি 'স্বামী দেবতা' বলিয়া গ্রহণ করিতে চলিয়াছ, তাহার সম্বন্ধে তোমাকে কোন কঠিন অপ্রিয় কথা শোনানো

হয়তো আমার উচিত হইবে না। সেজন্য আজিকার মত এইখানে পত্র শেষ করিলাম। আমার মানসিক অবস্থা বড় ভাল নাই। যদি তোমায় অপ্রিয় কোন কথা লিখিয়া থাকি, আশা করি, দরিদ্র শশধর-দা' তার জন্য অবশ্যই মার্জ্জনা পাইবে! ইতি—

তোমার—শশধর-দা—"

শশধর পত্রখানি ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিবার জন্য দরজা খুলিয়া বাহির হইতেই রমেশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। রমেশ হাসিতে-হাসিতে বলিল—হঠাৎ তুমি এত ভাবুক হয়ে উঠলে কেন, শশধর?

শশধর বলিল—তার মানে?

—তার মানে, তুমি আগেকার মত সেই ফুর্ত্তিবাজ শশধর তো নও!

—আর তুমিও কি ঠিক সেই রমেশই আছ নাকি?

রমেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—আমার যে পরিবর্ত্তন হবার মস্ত একটা কারণ আছে হে, শশধর!—তা বুঝি ভুলে গেছ?

শশধর নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল।

রমেশ হাসির বেগটা কিছু থামাইয়া বলিল—তাহলে আমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তোমার পরিবর্ত্তনেরও একটা সম্বন্ধ আছে বল?

শশধর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বেশ সহজ গলায় স্পষ্ট করিয়া বলিল—সম্বন্ধ আছে বৈকি রমেশ!

তীব্র হিংসায় রমেশের বুকের রক্ত চিন্‌-চিন্‌ করিয়া উঠিল—শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—মোহিনীকে হাত ছাড়া করতে হচ্ছে বলে বুঝি ?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শশধর মনে মনে বলিল—হতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—না রমেশ, তা নয়। মোহিনীকে আমি বোনের মত ভালবাসি—এবং সেইজন্যেই তার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখিত হচ্ছি।

কথাটা ঠিক রমেশ বুঝিতে পারিল না, বিরক্তভাবে বলিল—তুমি কি ভেবেছ শশধর, যে, মোহিনীকে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ?

হঠাৎ শশধর রমেশের হাত চাপিয়া বলিল—বিরক্ত হ'য়ো না ভাই, এ-সম্বন্ধে তোমাকে আমার বল্‌বার অনেক কথা আছে। আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও—সব কথা খুলে বল্‌ব।

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রমেশ ও শশধর ইডেন-গার্ডেনে গিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে মুখোমুখি হইয়া বসিল। রমেশের অন্তর রোষে ফুলিতেছিল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—তোমার যা বলবার আছে এখন বল্‌তে পার।

শশধর মুখের উপর একটা মৃদু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বলিল—ব'লবো ব'লেই তো তোমাকে টেনে আন্‌লাম রমেশ, নইলে তোমার বহুমূল্য সময় নষ্ট করতে যাবো কেন ?

রমেশ সেইরূপ ক্রুদ্ধকণ্ঠেই বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, বলো।

শশধর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি রোজ সন্ধ্যার সময় কোথায় যাও বল দেখি ?

রমেশের পাপ মনে ভীতির সঞ্চার হইল। সে শঙ্কা-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল—বায়স্কোপ দেখতে যাই, আবার কোথা যাবো?

শশধরের মুখের উপর মৃদুহাসির রেখা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, শ্লেষ-মিশ্রিত স্বরে বলিল—হ্যাঁ, রোজ বায়স্কোপ দেখতে যাও-ই বটে।

— তবে কোথায় যাই? রমেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

শশধর গলায় জোর দিয়া বলিল—রমেশ, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, তোমার এতটা অধঃপতন হ'তে পারে। আমি প্রথমটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, যার বাপের চরিত্র ভাগীরথীর জলের মত পবিত্র, তার কখন এতটা দুর্ম্মতি হতে পারে না। আমি হয়তো ভুল দেখেছি। কিন্তু উপরি-উপরি দু'-তিন দিন অনুসন্ধান নিয়ে যখন জানলাম যে আমার চোখ আমাকে প্রতারণা করেনি, তখন যে আমার কী লজ্জা, কী ঘৃণা, কত দুঃখ হতে লাগল, তা আর তোমাকে কি বলব! আমি তোমার সহোদর ভাই না হলেও তোমার বাপ-মা আমাকে তোমার সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম দেখেন না। আর আমিও তাঁদের নিজের মা-বাপের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকি। কাজেই বুঝে দেখ—

হঠাৎ রমেশ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। শশধরের হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—ভাই শশধর, এবারকার মত আমাকে মাপ কর। এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, রামকমলদের কুহক-জালে পড়ে আমি নিজের কত বড় একটা সর্ব্বনাশ করে ফেলেছি।

শশধরের হৃদয় ভ্রাতৃ-স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে রমেশকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহে কোঁচার কাপড়ে তাহার

চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—রমেশ, কেঁদ না ভাই। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়ে থাক। ভুল মানুষেই করে, ভুল সংশোধনও মানুষকেই করতে হয়।

স্নেহস্পর্শে ও সান্ত্বনাবাক্যে রমেশের দুই চক্ষু ছাপাইয়া প্রবল অশ্রুধারা ছুটিতে লাগিল। বলিল— বল, আমাকে এবারকার মত মাপ কল্লে তুমি ?

শশধরেরও চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে সে বলিল— তুমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছ, তখন তোমার ওপর আমার কোনো রাগ থাকতে পারে না—উচিতও নয়। তোমাকে আমি ক্ষমা কল্লাম! কিন্তু ভাই, আর কখনো সেখানে যেয়ো না।

রমেশ চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর, সে কিরূপে বন্ধুদিগের প্রলোভনে ভুলিয়া দিনের পর দিন পাপের পথে নামিয়া পড়িতেছিল তাহা শশধরের নিকট একে একে সব খুলিয়া বলিল। সমস্ত শুনিয়া শশধর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—যাক, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে আর ভেবে কি হবে! তবে এখন থেকে প্রাণপণে ওদের বন্ধুত্ব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কর। দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই, রমেশ!

রমেশ বলিল— এক মেসে থাকতে হলে ওদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলা বড় শক্ত হবে—হাসি-টিট্‌কিরীতে আমাকে জ্বালাতন করে তুলবে। তাই আমি মনে করেছি যে, তোমাতে-আমাতে মেস বদলে অন্য মেসে যাব।

—তারই বা দরকার কি, রমেশ? মন্দ পথ থেকে যদি কেউ ফিরে আসতেই চায়, তাতে হাসি-তামাসার কারণ ঘটবে কেন? ওরা যা বলে, তার জবাব দেবার জন্যে আমিই প্রস্তুত থাকলাম, তুমি কিছু ভেব' না।

রমেশ কহিল—কিন্তু আরো একটা কথা আছে, তুমি আপনা থেকে কখনো কিছু ব'লতে যেয়ো না যেন। তাহ'লে আমিই লজ্জিত হব।

শশধর রমেশের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—পাগল তুমি রমেশ!—এখনো শশধরকে চিন্‌লে না? তোমার অশুভ দেখবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় রমেশ,—আমি তোমাকে এত ভালোবাসি!

—নয়—

মোহিনীর বিবাহের আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী। রাধরতনবাবুর বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে প্রকাণ্ড চাঁদোয়া টাঙাইয়া উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জমিদারবাবুর একমাত্র পুত্রের বিবাহের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিষ্ঠ যুবকেরা কোমরে গামছা জড়াইয়া হাতে বাঁশের মোটা লাঠি লইয়া চারিদিকে অনাবশ্যক ব্যস্ততায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। ব্যাগপাইপ, ইংরাজী ও দেশী ঢুলির বাজনার শব্দে ইস্‌লামপুর গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

রমেশ ও শশধর কয়েকদিন পূর্ব্বেই বন্ধুবান্ধব সহ ইস্‌লামপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শশধর একদিন মোহিনীকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মোহিনী, এইবার সত্যি করে বল দেখি,—এ-বিয়েতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না?

তাহার এ-প্রশ্নের উত্তর মোহিনী পূর্ব্বে পত্রদ্বারা জানাইলেও, আজ যেন সে কেমন উন্মনা হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতরটার হঠাৎ

যেন কে ঘন ঘন হাতুড়ীর ঘা মারিতে লাগিল। সে নিরুত্তরে নতমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল।

মোহিনীকে তাহার প্রশ্নে বিপন্ন দেখিয়া বেশ একটু আগ্রহের সহিত বলিল—চুপ করে থেক না মোহিনী, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

তথাপি মোহিনী কোন উত্তর দিতে পারিল না।

শশধর তাহার কাছে সরিয়া গিয়া তাহার একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইল। তারপর তাহাতে মৃদু চাপ দিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী!

মোহিনী অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—কি বলছ?

—তুমি রমেশকে ভালবাস?

—বাসি।

শশধরের হাতের মধ্যে মোহিনীর হাতখানি বড় কাঁপিতে লাগিল। শশধর তাহার সে কম্পন যেন হৃদয়ের মধ্যেই অনুভব করিতে লাগিল। হাতখানিতে জোরে আর একটু চাপ দিয়া অবিশ্বাসের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছ, মোহিনী?

—আর যে কোনো উপায় নাই, শশধর-দা!

মোহিনীর কণ্ঠস্বরে করুণ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। শশধর আবেগ ভরে বলিল—কেন উপায় থাকবে না, মোহিনী! এখনও পাঁচ-ছ দিন সময় আছে। রমেশকে বিয়ে করতে তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে বল—এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যেমন করে হোক্ তোমার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে নিয়ে আসব। আর তাও যদি না পারি, তবে জ্যাঠামশায়কে সব কথা খুলে বলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দেব।

মোহিনীর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। এও কি সম্ভব? এত উদ্যোগ-আয়োজন সব কি তাহার একটা কথাতেই ওলোট-পালোট হইয়া যাইতে পারে? কিন্তু—কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে বেশ ভাল হয়।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া শশধর বলিল—কী বলছ, মোহিনী?

মোহিনী অতি কষ্টে একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল—কিন্তু সহসা কে যেন ভিতর হইতে তাহার কণ্ঠ জোরে চাপিয়া ধরিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। শশধর অধীর হইয়া বলিল—বল মোহিনী, আর আমাকে কষ্ট দিও না।

কিন্তু মোহিনী কি বলিবে? সকলের প্রাণে আঘাত দিয়া, এত বড় সাংসারিক আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করিয়া শশধরও কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। আর শশধর সম্মত হইলেও সে কি তা করিতে পারে? না—না, এ সম্ভবপর নহে।

মোহিনী স্পষ্টকণ্ঠে বলিল—আমি রমেশ-দাকেই বিয়ে করব।

শশধরের মুখখানিতে কে যেন হঠাৎ কালি মাখাইয়া দিল! সে ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই তোমার অন্তরের ইচ্ছা মোহিনী? আর তো কিছু বলবার নেই?

অবিচলিত কণ্ঠে মোহিনী উত্তর দিল—না।

শশধরের দেহ-মন চুরমার করিয়া দিয়া একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস প্রবল ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেল। সে অতি কষ্টে "আচ্ছা" বলিয়া অবশ দেহটাকে কোনমতে টানিয়া বন্ধুদের সঙ্গীত-মুখরিত ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

—দশ—

রমেশের সহিত মোহিনীর বিবাহ ধুমধামে সম্পন্ন হইয়া যাইবার পরে—ফুল-শয্যার রঙিন-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় কলহাস্য-মুখরা প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক-গণ মহা উৎসাহে মোহিনীকে ফুল-সাজে সজ্জিত করিতে বসিয়াছে। বেলা, যুঁই, চামেলি, হেনা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী ফুলের অলঙ্কারে মোহিনীর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে। পাতা-কাটা খোঁপার উপরে পাতাশুদ্ধ গোলাপগুচ্ছটী বড় সুন্দর দেখাইতেছে। যেন বিধাতার নিপুণ হস্তের সযত্ন রচিত একখানি সুন্দর পুষ্প-প্রতিমা। মোহিনী যুবতী-দিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছে ও সঙ্গিনী-দিগের পৃষ্ঠের উপর কোমল হস্তের মৃদু কীল-চাপড় চালাইতেছে—কিন্তু কোনমতেই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেছে না। সঙ্গিনীগণ বরং তাহাতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কল-হাস্যে গৃহখানি মুখরিত করিয়া ক্ষিপ্র হস্ত চালনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুলের উপর ফুল চাপাইয়া দিতেছে।...প্রায় ঘণ্টা তিন পরে মোহিনী মুক্তি লাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একটা সুন্দর সিল্কের সেমিজের উপর যখন সে কাল জরি-পাড় সাড়ী-খানি পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মোহিনী তাহা দেখিয়া লজ্জায় সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দরতর করিয়া মুখ নীচু করিতেই তাহার 'গোলাপ-জল' সুধাময়ী ছুটিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার গালে চুম্বন করিয়া ফেলিল। একটা

নূতন কৌতুকে সকলেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহিনী লজ্জারক্ত মুখে সুধাননীকে ঠেলিয়া দিয়া কৃত্রিম রোষের সহিত বলিল—মর পোড়ারমুখী—

—বালাই, ষাট! এমন শুভ-দিনে আমি মরতে যাব কেন লো?

—তবে এ-সব করছিস কেন?

সুধাননী মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলাইয়া বলিল—নইলে রমেশ-দা যে তো'কে পছন্দ করবে না।

—ইস্! পছন্দ না করলেই হ'লো?

—ইস্ নয় লো,—তুই তো পুরুষ মানুষকে চিনিস-নে! ওরা বাইরের চটক্‌টাই যে বেশী চায়।

—তুই বুঝি খুব চিনেছিস্, না?

—তা তোর চেয়ে তো চিনেছি।

—মাত্র এই এক বছর বিয়ে হয়েই?

—হ্যাঁ। এই এক বছরের মধ্যেই অনেকটা ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছি।

—মাইরি?

মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুধাননীও মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর হাসির বেগটা কিছু থামিলে আরও কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া মোহিনী তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া বিছানার উপর মুখ ঢাকিয়া ঝুপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

রমেশ তাহারই অপেক্ষায় ইজি-চেয়ারের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া একখানি উপন্যাসের উপর চোখ বুলাইতেছিল। মোহিনী শুইয়া পড়িলে

সে প্রফুল্ল মনে দরজায় খিল লাগাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মোহিনীর কাছে গিয়া ডাকিল—মোহিনী!

লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিল না। রমেশ তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা অপূর্ব্ব পুলক শিহরণ শির্‌-শির্‌ করিয়া জাগিয়া উঠিল। আঃ, মোহিনীর গা'টা কি নরম! সে মোহিনীকে ইহার পূর্ব্বে কতবার স্পর্শ করিয়াছে—কিন্তু এমন আরাম তো সে কোনো দিনই পায় নাই! বিবাহের সামান্য কয়েকটা মন্ত্রের মধ্য দিয়া ভগবান তাহার দেহে আজ কি অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন! রমেশ বিহ্বল হৃদয়ে দুই হাত দিয়া মোহিনীকে জড়াইয়া ধরিল। মোহিনী ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—যাও!

—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব, মোহিনী? আমার স্থান কোথায়?

বলিয়া রমেশ আরও জোরে তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

—যাও, জানিনে।

বলিয়া মোহিনী মুখ ঘুরাইয়া রহিল। রমেশ সুযোগ বুঝিয়া তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। লজ্জায় রাঙা হইয়া মোহিনী বলিল—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু।

—আর তুমি খুব ভাল, না?

রমেশ তাহার গোলাপী গণ্ডে আবার একটি চুম্বন করিল। মোহিনী আরও রাঙা হইয়া বলিল—জানিনে!

—তবে চুপ করে থাকো।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি চুম্বন পড়িল। মোহিনী ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুই হাতে রমেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ঘাড়ের উপর মুখ গুঁজিল। রমেশ তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল—কিন্তু মোহিনী প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না না, আর না, এইবার চুপ করে শোও। প্রথম দিন থেকেই এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়—শেষ পর্যান্ত হয় তো ঠিক থাকবে না। পুরুষের মন তো!

কথাটা মোহিনীর মুখ হইতে হঠাৎ রহস্যচ্ছলে বাহির হইলেও, কি জানি কেন, তাহাই তাহার হৃদয়ের কোন্ গভীর তন্ত্রীতে গিয়া একটা মৃদু আঘাত করিল, আর তাহাতেই যেন সে পরক্ষণেই অনেকখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

রমেশ তাহার সে ভাব দেখিতে পাইল না—পিঠের উপর একটা মৃদু চাপ দিয়া বলিল—না মোহিনী, আমাদের এ প্রণয় চিরকাল সমান থাক্‌বে—কোনদিন এর এতটুকুও নড়চড় হবে না—কিছুতেই না।

মোহিনী কোন উত্তর দিল না, নীরবে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। রমেশ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মোহিনীকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—মোহিনী, আজ আমার কাছে একটা সত্যি কথা বলবে?

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে মোহিনীর বুকটা হঠাৎ দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ঢোক গিলিয়া বলিল—কি সত্যি কথা?

—তুমি কি শশধরকে ভালবাস?

মোহিনীর সুন্দর মুখখানি এক নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। শরীরের সচল রক্ত হঠাৎ একটা বাধা পাইয়া যেন নিশ্চল হইয়া পড়িল। সে কম্পিত অস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল—বাসি।

—তার সঙ্গে আজ তোমার বিয়ে হ'লে তুমি বোধ হয় এর চেয়েও বেশী সুখী হতে—না ?

রমেশের কণ্ঠস্বরে মৃদু শ্লেষের ভাব ফুটিয়া উঠিল। মোহিনী কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার হৃদয়-রাজ্যে যে একটা প্রবল তুফান উঠিল, তাহা তাহার দেহ-মনকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া ফেলিল। সে স্তব্ধভাবে নত-মুখে বসিয়া নিজের কাপড় খুঁটিতে লাগিল। তাহার এই আকস্মিক ভাব-বিপর্য্যয়ে রমেশও অন্তরে বড় কম আঘাত পাইল না।

রমেশ বিস্মিত হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী !

মোহিনী নতমুখে উত্তর দিল—কেন ?

যদি তুমি শশধরকেই মনে মনে ভালবাসতে, তাহলে আগে তা আমাকে খুলে বল্লে না কেন ? তোমার জন্যে আমি আমার সমস্ত সুখকেই সানন্দে জলাঞ্জলি দিতে পারতাম।

এ প্রশ্নের উত্তরে সে স্বামীর মুখের উপর কি যে বলিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। রমেশ কিছুক্ষণ থামিয়া সহসা মোহিনীর একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—এখন আর উপায় কি মোহিনী ?

স্বামীর সে কণ্ঠস্বরে মোহিনী চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো, এখন উপায় কি ? আর তো শশধরকে মনের মধ্যে স্থান দেওয়া চলে না ! সে যে এখন অপরের বিবাহিতা স্ত্রী ! মনে মনে পর-পুরুষের চিন্তা করাও যে এখন তাহার পক্ষে পাপ !

মোহিনী ভাল হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তোমার পায়ে পড়ি, এই অযোগ্যাকে তুমি

সামান্য কিছুদিন সময় দাও—নিশ্চয় আমি শশধর দার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে দেব।

—পারবে?

—পারব। কেন পারবো না?—আমি যে হিন্দু নারী।

রমেশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার ভিতরটা কি একটা অব্যক্ত যাতনায় চিন্ চিন্ করিতে লাগিল। মোহিনীও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে অতিবাহিত করিল। তারপর মোহিনী রমেশের গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিল—ঘুমুলে নাকি?

ঘুম? এত যাতনার উপরেও কি ঘুম আসা সম্ভব? রমেশের হাসি পাইল। নিজের স্ত্রী, একজন পর-পুরুষকে ভালবাসে, তাহা জানিয়াও কি কোন স্বামীর ঘুম আসিতে পারে! রমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—না, ঘুমুইনি।

মোহিনী তাহার একখানি হাত স্বামীর বুকের উপর এলাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া বিমনা হইয়া কি ভাবিল, তারপর অপরাধের গুরুভারে কণ্ঠস্বর ভারী করিয়া বলিল—আমাকে ক্ষমা কর।

রমেশের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ একটা নাড়া পাইয়া সজোরে কাঁপিয়া উঠিল, বলিল—তুমি তো' আমার কাছে কোন দোষ করনি মোহিনী!

মোহিনীর চোখের কোণে মুক্তার মত কয়েকবিন্দু অশ্রু জমিয়া আসিল, বলিল—দোষ করেছি বৈকি।

প্রতিবাদের সুরে রমেশ বলিল—না, না মোহিনী, তোমার কোন দোষ নাই। তুমি যদি আজ আমার কাছে তোমার অন্তরের কথা গোপন

করতে, তাহলে তোমার দোষ হ'ত বটে—কিন্তু তুমি তা করনি। সুতরাং আমি তোমাকে কোন মতেই দোষী বলতে পারিনে। বরং সাধারণ স্ত্রীলোকের মত তুমি সৎসাহসের অভাব দেখাওনি বলে আমি তোমার প্রশংসা করি।—তুমি যে সাধারণ নও, আজ তা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে টের পেয়েছি।

মোহিনী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—না না, আমি দোষ করেছি, আমাকে শাস্তি দাও।

তাঁহার কাতর প্রাণের করুণ অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমেশের হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল। দুই হাত দিয়া টানিয়া তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—মোহিনী, কেঁদ' না। এটা মনে রেখো যে, তুমি মানুষ—আর মানুষের প্রবৃত্তি নিয়েই তুমি জন্মেছ।

স্বামীর সান্ত্বনাবাক্যে মোহিনী প্রাণে শান্তি অনুভব করিল না। স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল। রমেশ তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আর একটি চুম্বন করিয়া কোঁচার কাপড়ে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—ছিঃ মোহিনী! আজ কি এমনি করে কাঁদতে আছে! আজ যে আমাদের ফুল-শয্যা!—আজ আনন্দের দিন!

সত্যই তো, আজ যে তাহাদের শুভ ফুল-শয্যা? আজিকার দিনে কি শোকতাপের অশ্রু ফেলিয়া ভবিষ্যৎ-জীবনের অমঙ্গলের সূচনা করিতে আছে! মোহিনী মুখ তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর জোর করিয়া চোখের জল রোধ করিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক

কণ্ঠে বলিল—সত্যি-সত্যিই আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছে—অ জকের দিনে চোখের জল ফেলা উচিত হয়নি।

এত শীঘ্র মোহিনীকে প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া রমেশের মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল, প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল—যাক্‌গে, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্যে আর অনুতাপ করতে হবে না। আজকের রাত্রি কষ্টে কাটানো উচিত নয় মোহিনী!—আমি চাই তোমাকে, তুমিও চেষ্টা করো আমাকেই চাইতে! মনস্থির করলেই সব গোল মিটে যাবে। মোহিনী—দুঃখ কেন?

রমেশ মনের সমস্ত ক্লেদ মুছিয়া ফেলিয়া হৃষ্টচিত্তে নব-পরিণীতা পত্নীকে আপনার প্রসারিত বক্ষের মাঝে টানিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে উষার ক্ষীণ আলোক রশ্মি উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িল। সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির সুবাস চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। পাখীর কণ্ঠে – বনানীর শীর্ষে-শীর্ষে প্রভাত-বন্দনা সুরু হইয়া গেল।

রমেশ অনুতপ্তা মোহিনীর বাহুপাশমুক্ত হইয়া মনে মনে বলিল—অন্তর্য্যামী প্রভু! আমাকে শান্তি দাও, আমার মোহিনীকে শান্তি দাও! তার মনের ময়লা দূর করো প্রভু, সে আজ শঙ্কিত—অনুতপ্ত—বিপন্ন!

—এগারো—

মোহিনী ও রমেশের বিবাহের পর এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই জমিদারগৃহে ওলাউঠাদেবী মূর্ত্তিমতী প্রলয়কারিণীর ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন ও নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার প্রলয়কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া রামরতনবাবু ভীত হইয়া রমেশ ও শশধরকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা, তোমরা আর এখানে থেকো না, আজই বিকালের গাড়ীতে কলকাতা চলে যাও।

রমেশ স্বীকৃত হইল। শশধর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ আমরা যাচ্ছি, কিন্তু কাল-পরশুর মধ্যে আপনাদেরও যেতে হবে।

বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া রামরতনবাবু বলিলেন—তাই কি হয় বাবা! আমরা সকলে মিলে গেলে এত বড় সংসারটা দেখবে কে?

আব্‌দারের স্বরে শশধর বলিল—তা হবে না। সংসার আগে না জীবন আগে? আপনাদের যেতেই হবে।

সুযোগ বুঝিয়া রমেশও ধরিয়া বসিল—হ্যাঁ বাবা, তাই করুন। আমরা আজ গিয়ে একটা বাসা ঠিক করে রাখিগে—কাল আপনারা যাবেন। তারপর ব্যারাম-স্যারাম একটু কম পড়লেই আবার ফিরে আসবেন।

রামরতনবাবু বুঝিয়া দেখিলেন, কথাটা নেহাৎ মন্দ নহে। তাঁহার গৃহে দেবীর যেরূপ রোষ-কষায়িত দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুদিন অন্যত্র

গিয়া বাস করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন— আচ্ছা, তাই ঠিক করগে। আমি কাল বলরামকে সঙ্গে দিয়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দেব।

শশধর বলিল—আপনাকেও যেতে হবে।

চিন্তিতভাবেই রামরতনবাবু বলিলেন—তা তো হয় না বাবা! আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন এ-বাড়ীতে না থাকলে তো চল্‌বে না।… এত বড় সংসার…ঝক্কি কত!

শশধর আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাঁহার আদেশমত সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে রমেশকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া একটা বাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিল।

রামরত বাবুই যোগমায়া ও মোহিনীকে লইয়া কলিকাতার বাসায় গেলেন। কিন্তু যে ভয়ে গেলেন তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। কলিকাতায় আসিবার পরদিন হইতেই তাঁহার ভেদ-বমি আরম্ভ হইল। সংবাদ পাইয়া বলরামবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সহরের বড় বড় চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু ওলাদেবী পরাজিত হইলেন না। সপ্তম দিবসে তিনি তাঁহার ধ্বংসকার্য্য শেষ করিয়া বিজয়োল্লাসে ভীষণ অট্টহাসি হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যেক হাঃ হাঃ ধ্বনিতে যেন জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সদ্য-বিধবা যোগমায়ার বিধ্বস্ত বুকখানাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশ দেহে—অবশ প্রাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ওলাদেবী সাদরে তাঁহাকেও জঠরানলে আহুতি দিয়া তাঁহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কিঞ্চিৎ-প্রশমিত করিয়া ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিলেন।

যোগমায়ার মৃত্যুর পরদিন বলরামবাবু রমেশকে ডাকিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—বাবা, এ-বাড়ীতে তো আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না। চল, ও-বেলার গাড়ীতে সকলে মিলে বাড়ী ফিরে যাই।

রমেশ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—বাড়ীতে আর কার কাছে যাব কাকাবাবু?

তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া প্রবলবেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

সস্নেহে তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলরামবাবু সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—কি করবে বাবা, তাঁদের সময় শেষ হয়ে এসেছিল—তাঁরা চলে গেলেন। তাই বলে তো জন্মভূমি ত্যাগ করা চলে না।

উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ কতকটা রোধ করিয়া রমেশ বলিল—না কাকাবাবু, আমি এখন সেই শূন্য পুরীতে কিছুতেই যেতে পারব না, আপনারা যান।

বলরামবাবু বালকের ন্যায় ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—তোমাকে একলা ফেলে যে আমরাও যেতে পারব না বাবা!

—তবে এইখানেই আর কিছুদিন থেকে যান।

কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া বলরামবাবু বলিলেন—তাঁদের যে শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করতে হবে বাবা!

—এখান থেকেও তো সে-সব শেষ করা যেতে পারে।

—না বাবা, তা হবে না। যাঁদের অত নাম ডাক, তাঁদের শেষ কাজ তো এমন সামান্যভাবে করলে চলবে না, তাতে যে তাঁদের স্বর্গগত আত্মার প্রতি অসম্মান দেখান হবে!

ইহার উপর রমেশ আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। বলিল—তবে আজই চলুন। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমি শশধরকে নিয়ে চলে আসব।

সেইদিন বৈকালের গাড়ীতে সকলে মিলিয়া সন্তপ্তচিত্তে ইসলামপুর যাত্রা করিল।

বাড়ী পৌছিয়াই মোহিনী যোগমায়ার ঘরে ছুটিয়া গিয়া সে-ঘর উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রমেশের পিসীমা ও দুই একজন আত্মীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মোহিনীর সে হৃদয়-ভেদী বিলাপ-ধ্বনিতে বনের পশু-পক্ষীও কাঁদিয়া ভাসাইল।

বেলা তিনটার সময় রমেশ "হলিস্ক্রি" সারিয়া শশধরের কাছে আসিয়া বলিল—শশধর, মোহিনী তো কারুর কথাই শুনছে না, তুমি একবার গিয়ে চেষ্টা করে দেখ দেখি?

মোহিনী যে সকাল হইতে জলটুকুও স্পর্শ করে নাই, তাহা শশধর শুনিয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া তাহাকে একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে যাইতে পারে নাই। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মোহিনী আর তাহার কেহ নহে। তাহার কোনরূপ সংস্পর্শে আর সে যাইতে পাইবে না। হতাশার এই তীব্র ধ্বনিটা তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া এরূপ একটা বিকট প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়াছিল, যাহাতে, সে প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও মোহিনীর ঘরের দিকে পা বাড়াইতে পারিতেছিল না। রমেশের কথা শুনিয়া সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আমি! · আচ্ছা ··

তারপর ধীরে ধীরে মোহিনীর ঘরের সম্মুখে গিয়া শশধর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি! একি সেই মোহিনী—যাহার স্বভাব-সুন্দর সরল মুখখানিতে সর্ব্বদা হর্ষের ঢেউ খেলিয়া বেড়াইত? যাহার অনুপম

সৌন্দর্য্যরাশি শশধরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিত? না না, এ তাহাদের সে মোহিনী হইবে কেন! এ যে মোহিনীর রূপধারিণী মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা! শশধর অতি কষ্টে চক্ষুর জল রোধ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া মোহিনীর পার্শ্বে বসিল।

মোহিনী একবার চোখ মেলিয়া তাহার অশ্রু-প্লাবিত মুখের দিকে চাহিল। তারপর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। শশধর রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী!

মোহিনী উত্তর দিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শশধর পুনরায় ডাকিল—মোহিনী!

তথাপি মোহিনী কোন উত্তর দিল না, একই ভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শশধর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর মোহিনীর একখানি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী, লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার!

মোহিনী ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে উত্তর দিল—সহ্য করতে যে পারি না শশধর-দা, আমি যে সত্যিই মাতৃহীন! এত বড় বাড়ীতে, এই শ্মশানে আজ কেমন করে আমি থাকবো!

—একটু শান্ত হও বোন্!

মোহিনীর চোখের কোণে আবার বান ডাকিল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল—মন যে কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না, শশধর-দা!

কী করুণ মর্ম্ম-স্পর্শী হতাশ-কাতরধ্বনি! শশধরের শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সে স্বরের ব্যাকুল মূর্চ্ছনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সেও আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। তারপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ডাকিল—মোহিনী!

মোহিনী রুদ্ধকণ্ঠেই উত্তর দিল—কি বলছ?

—কেঁদে আর কি করবে বল? তাঁদের কাল পূর্ণ হয়ে এসেছিল তাই তাঁরা চলে গেলেন।

—কিন্তু আমার দশা কি হবে শশধর-দা?

—তোমার তো তাঁরা ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, মোহিনী! বাবা আছেন, আমি আছি, রমেশ আছে—তোমার ভয় কি বোন্?

—কার কাছে আর 'মা' বলে দাঁড়াব?

—মা-বাপ তো চিরকাল থাকে না, মোহিনী! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে কেন অবোধের মত অস্থির হচ্চ? চল, এখন দুটী কিছু মুখে দেবে।

মোহিনী উঠিতে চাহিল না। বলিল—আমার ক্ষিদে নাই শশধর-দা।—খেতে আমি পারবো না কিছুতেই। বাড়ীর অন্য সকলকে খেতে বলগে।

—না না, যা পারো চাট্টি মুখে দিয়ে এস। তুমি না খেলে আর কেউ খাবে না! মনে রেখ, এখন থেকে তুমিই এ-বাড়ীর স—ব!

মোহিনী অগত্যা উঠিয়া খাইতে গেল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে একদিন রমেশ মোহিনীকে বলিল—এইবার তো আমাকে কলকাতা যেতে হবে মোহিনী।

মোহিনী স্বামীর পার্শ্বে মেঝের উপর বসিয়া বলিল—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। আমি এখানে একলা থাকতে পারব না।

রমেশ সস্নেহে বলিল—একলা থাকতে যাবে কেন? এখানে তো সবাই থাকল, তাদের সঙ্গেই থাক্‌বে।

মোহিনী স্বীকৃত হইল না। বলিল—ওগো, না না, গিন্নী হ্‌তে আমি চাইনে। উপস্থিত কিছুদিন আমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে পারব না—কিছুতেই না। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

রমেশ হাসিয়া বলিল—তাহলে লোকে বলবে কি, মোহিনী! এই তো সেদিন বিয়ে হল—এরই মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি তো ভাল নয়!·· তা-ছাড়া ঘর-সংসার সবই তোমার, তুমি যদি না দেখ—

লজ্জায় মোহিনীর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল—ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিল—যাও, তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমি যেতে চাইনে। আমি শশধর-দাকে বল্‌ব। সে আমার কথা কখনই ঠেলতে পারবে না।

রমেশও হাসিয়া বলিল—তাই ব'লো। সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় তো যেও, আমার কোনো আপত্তি নাই।

—বেশ।

শশধর একাগ্রমনে বাক্সের মধ্যে জামা-কাপড় গুছাইয়া রাখিতেছিল। হঠাৎ মোহিনীর গুরুগম্ভীর পদক্ষেপে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে, মোহিনী?

—হ্যাঁ, শশধর দা। বলিয়া মোহিনী মৃদু হাসিয়া তাহার পার্শে বসিল। শশধর বাক্সের তালা বন্ধ করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ অসময়ে—ব্যাপার কী—কি মনে করে আগমন? কোনো কাজ আছে নাকি?

—কাজ, হাঁ, একটু আছে বৈকি।

বলিয়া মোহিনী আবার মৃদু হাসিল। শশধর কিছু বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি কাজ বল!

—তোমরা কবে কল্‌কাতায় যাচ্চ?

—আস্‌ছে সোমবারে বোধ হয়।

—আমাকে শুদ্ধু সঙ্গে নিয়ে চল।

শশধর তাহার প্রস্তাব শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। যে লোক বাড়ী ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে চাহিত না, সে আজ স্বেচ্ছায় তাহাদের সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিতেছে কেন? তাহাকে নীরব দেখিয়া মোহিনী বলিল—কি শশধর-দা, আমার কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলে যে?

শশধর বলিল—অবাকই তো হবার কথা, মোহিনী! তুমি যে আগে বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়তে চাইতে না। আজ হঠাৎ ক'লকাতা যাবার সাধ হ'ল—

মোহিনী গম্ভীরভাবে বলিল—যখন চাইতাম না তখন চাইতাম না। এখন যখন চাচ্ছি, নিয়ে যেতে পারবে কি না বল?

শশধর হাসিয়া বলিল—নিয়ে যেতে পারব না কেন? তবে সেখানে গিয়ে কি তুমি একলা থাক্‌তে পারবে?

—একলা থাক্‌তে যাব কেন, তোমরা থাকবে যে!

কথাটা বলিয়াই মোহিনী সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। শশধর বুঝিতে পারিয়া বলিল—এতে আর লজ্জা কি, স্বামীর কাছে সকল স্ত্রী-ই তো থাকে, তুমিও থাকবে। এ-তো সুখের বিষয়!

—যাও!

মোহিনী লজ্জায় আরও রাঙা হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শশধর হাসিতে হাসিতে বাক্সের জামা কাপড় গুছাইয়া লইয়া বলরামবাবুর নিকট উপস্থিত হইল।

বলরামবাবু সদর-মহলের একটি ঘরে বসিয়া একাকী একখানি হিসাবের খাতা দেখিতেছিলেন। শশধর তাঁহার কাছে গিয়া বসিতেই তিনি খাতাখানি বন্ধ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যে শশধর, তাহলে তোমাদের যাওয়া হচ্চে কবে?

—সোমবারেই যাব মনে কচ্চি, কিন্তু—

শশধর হঠাৎ থামিয়া গেল। বলরামবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু কি?

—মোহিনী আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে।

—মোহিনী।...কেন?...হঠাৎ—?

বলরামবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। শশধর নতমুখে উত্তর করিল—ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে রয়েছে। বলে একা-একা বাড়ীতে আমি থাকতে পারবো না. জ্যাঠাইমাকে কোনো রকমেই ভুলতে পারছে না কিনা, তাই দিনকতক ক'লকাতা গেলে আনমনা হতে পারবে।

—আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। বলিয়া বলরামবাবু খাতাপত্র গুটাইয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়া ডাক দিলেন—মোহিনী!

মোহিনী তাহার ঘরে বসিয়া একখানি খঞ্চিপোষ বুনিতেছিল। পিতার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—আমাকে ডাকছ, বাবা?

—হ্যাঁ মা। তোর সঙ্গে একটু কথা আছে। বলিয়া বলরামবাবু মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

কথাটা যে কি, তাহা মোহিনী বুঝিতে পারিল। লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। সে সঙ্কুচিতভাবে পিতার নিকট বসিল। বলরামবাবু বার-দুই কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি শশধরের সঙ্গে কল্‌কাতা যেতে চাচ্ছিলে?

মোহিনী মৃদুকণ্ঠে "হ্যাঁ" বলিয়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

—তাহলে এ-বাড়ীতে থাক্‌ছে কে?

মোহিনী মুখ তুলিয়া বলিল—কেন, পিসীমা!

বলরামবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—পাগল! তুই কি একলা সেখানে গিয়ে থাক্‌তে পারবি? তুই গেলে তোর পিসীমাকেও যে তোর সঙ্গে যেতে হবে।

—তবে?

বলরামবাবু সেইরূপ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তবে আর কি? যাওয়া তোর হবে না। আর তোরা সবাই চলে গেলে আমিই বা এ-বাড়ীতে একলা কি করে থাক্‌ব?

মোহিনী হতাশভাবে বলিল—বাড়ীখানা আমার ঠিক খাঁচার মত মনে হচ্চে বাবা,...তাহলে উপায় যখন নাই-ই, অগত্যা আমি এইখানেই থাক্‌ব!

বলরামবাবু কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তুই তো আমার অবুঝ মেয়ে নস্ মোহিনী, এতবড় এই রাজসংসারের তুই



ছিঃ মোহিনী ! কেঁদো না ! যেমন করে পারি আমি তোমার এ বিয়ে ভেঙে দেব।

রাণী ; ··ছেড়ে কোথায় গিয়ে থাক্‌বি, মা ? তোর কাছে আজ অসংখ্য লোক সুখ চায়—সান্ত্বনা চায় মা. কিন্তু দায়িত্ব তোর এত বেশী, তোকে সান্ত্বনা দিবার লোক না থাকলেও অনুযোগ করার কারণ তুই খুঁজে পাবিনি। হিন্দুর ঘরের বধূ বসুন্ধরার মত সর্ব্বংসহা, দুঃখ স'য়ে সুখ বিলোতে তার জন্ম···কিন্তু তুই মুখে 'না' বল্‌ছিস বটে—কিন্তু মনে মনে আমার ওপর ভারী রেগে উঠেছিস ! না-রে ?

মোহিনী কোন উত্তর দিল না—বিষণ্ণ নতমুখে কাপড়ের আঁচল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

বলরামবাবু আরও কিছুক্ষণ নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে বলিলেন—আচ্ছা, এবারকার মত কিছুদিন গিয়ে থেকে আয়। মনটা খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক তো নয় মা, তা ছাড়া সত্যিই তো···

মোহিনী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আর পিসীমা ?

—পিসীমাকেও তোর সঙ্গে যেতে হবে।

—তা হলে একলা তোমার কষ্ট হবে যে।

—কষ্ট আর কি হবে ? বাড়ীতে আরও তো লোকজন আছে তা-ছাড়া তোরাও ওখানে বেশী দিন থাকছিস্‌-নে যখন, কোনো রকমে ক'টা দিন কাটিয়ে নিতে পারবো।

মোহিনী আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা।

—তাহলে একটা ভাল দেখে বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দিইগে।

বলিয়া বলরামবাবু বাহির-বাড়ীর দিকে উঠিয়া গেলেন। মোহিনীও আনন্দ-উৎফুল্ল হৃদয়ে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইবার জন্য নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু এই হর্ষাতিশয্যের মাঝেও সূক্ষ্ম ব্যথার যাতনা তার অন্তরকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। হায় রে! আজ যদি জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামহাশয় থাকিতেন!...বাবা বলেন, এত বড় রাজসংসারের আমি রাণী! কী প্রয়োজন ছিল এই দুঃখের রাণীগিরিতে!

ঘণ্টাখানেক পরে শশধর আসিয়া বলিল—তাহলে যাওয়াই ঠিক তো ...স্বামী-সন্দর্শনে?

মোহিনী সলজ্জ হইয়া মাথা হেঁট করিল।

শশধর বলিল—এতে আর লজ্জা কি? যা সত্যি তাইতো ব'লছি... স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়া নয়?

মোহিনী মুখ তুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—তোমার কি মনে হয়?

—যা মনে হয়, তা তো বললামই।

—তবে আবার ন্যাকাপনা করো কেন?

—বারো—

রমেশের নূতন বাসা হইল কলিকাতার স্কটস্ লেনে। বাড়ীটা খুব বড় না হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিয়া মোহিনীর পছন্দ হইল। সে তাহার পিসীমা মন্দাকিনীর সাহায্যে দুই দিনের মধ্যেই রীতিমত সংসার পাতিয়া বসিল।

দুই তিন দিন পরে একদিন শশধরের শরীরটা বড় ভাল ছিল না বলিয়া সে রমেশের সঙ্গে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইল না। রমেশ

একাকীই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর মোহিনী হাতের কয়েকটা হাল্‌কা কাজ সারিয়া শশধরের নিকটে গিয়া বসিল। শশধর একখানি ইজি-চেয়ারের উপর কাৎ হইয়া বসিয়া কি একখানা নূতন উপন্যাস পড়িতেছিল। মোহিনীর পায়ের শব্দ পাইতেই বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —এই যে মোহিনীদেবী, হঠাৎ কি মনে করে?

—বল দেখি, কি মনে করে?

বলিয়া মোহিনী তাহার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শশধর হাসিতে হাসিতে বলিল—তোমার মনের কথা আমি কি করে বল্‌ব? দৈবজ্ঞির ব্যবসাটা তো আর শি

—তবুও, আন্দাজ কর দেখি?

শশধর ভাবিবার ছলে কিছুক্ষণ উপরের দিক চাহিয়া বলিল—বাড়ী ফিরে যাবার বোধ হয় ইচ্ছে হয়েছে?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল—উঁহু

—তবে?—আজ রাত্রে পোলাও-মাংস হবে বুঝি? বাজারে যাবো?

—দূর!...তোমার বিয়ের কথা কইতে এলাম।

মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া উঠিল।

—তুমি দিন-দিন ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছ মোহিনী! শাসন দরকার হ'য়েছে তোমার।

বলিয়া শশধর অর্দ্ধপঠিত উপন্যাসখানা তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর ধরিল।

হাসির বেগটা কিছু থামাইয়া মোহিনী বলিল—এতে আর আমি দুষ্টুমির কথা কি বল্লাম! বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে, না সন্নেসী সেজে লোটাকম্বল সম্বল করবে?

উপন্যাসখানি মুখ হইতে সরাইয়া শশধর বলিল—বিয়ে করতেই যে হবে, তার তো কোন মানে নাই!

মোহিনী গলায় জোর দিয়া বলিল—তা আছে বৈকি। সংসারে থাকতে হলেই বিয়ে কর্‌তে হয়।

—তার কারণ?

—নইলে তুমি থাক্‌বে কি অবলম্বন নিয়ে?

—কেন, তোমাদের নিয়ে, তোমাদের ছেলে-পুলে মানুষ করে!

ছেলে-পুলের কথা শুনিয়া লজ্জায় মোহিনীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, নতমুখে বলিল—ও-সব ওজর শুন্‌ব না, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। ন্যাকামি-কথা ঢের শুনেছি।

শশধর হাসিয়া কহিল—যদি না করি তবে কি করবে, শুনি?

—তাহলে তোমার সঙ্গে আমরা কেউ কথা কইব না।

—পারবে, কথা না ক'য়ে থাক্‌তে?

—খুব পারব।

—আচ্ছা তাই একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

বলিয়া শশধর উঠিয়া আল্‌মারী হইতে কলেজের বই বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। মোহিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় পড়াশুনা শেষ করিয়া শশধর মোহিনীর ঘরের বাহির হইতে ডাকিল—মোহিনী!

মোহিনী একখানি টুলের উপর বসিয়া সেলাই করিতেছিল। হাতে কাঁটা চালাইতে চালাইতেই সাড়া দিল—কেন?

—রমেশ এসেছে?

—না।

শশধর বিস্মিত হইয়া বলিল—রাত্রি দশটা বাজতে চললো…এখনও বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলো না! ব্যাপার কী?

অন্যমনস্কভাবে মোহিনী উত্তর দিল—কই আর ফিরলো

—একবার দেখব নাকি?

মোহিনী সেলাইএর সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—এত রাত্রে আর কোথায় তুমি খুঁজতে যাবে? খেয়ে-দেয়ে শোওগে, যখন হয় সে আসবে।

মৃদু হাসিয়া শশধর বলিল—খাবার আজ তাড়াতাড়ি নাই মোহিনী

—তবে বসে-বসে বই মুখস্থ করগে। মাথায় নাই বুদ্ধি, খালি-খালি মুখস্থ আর মুখস্থ! কলেজের পড়ায় অত চীৎকার কে করে—তোমার মতন?

মোহিনী মৃদু হাসিয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

শশধর উচ্চকণ্ঠে বলিল—সত্যি মোহিনী, তুমি যেও না, আমি একটু পরে খাবো।

মোহিনী কিন্তু শুনিল না, বলিল—ও-সব আব্দার চ'লবে না। খেয়ে দেয়ে যা ইচ্ছে হয় করগে।

বলিয়া বামুনঠাকুরকে ডাকিয়া খাবার দিতে বলিল। শশধরকে অগত্যা উঠিতে হইল।

শশধর খাইতে-খাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—এটা ভারী অন্যায় কিন্তু মোহিনী।

মৃদু হাসিয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল—কোন্‌টা ?

—এই রমেশের ব্যবহারটা।

—কেন ?

—এই যে আজকাল মধ্যে-মধ্যে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে থাকচে, এটা কি ভাল ?

—কেন ভাল নয় শশধর-দা ?

গম্ভীর ভাবে শশধর বলিল—কল্‌কাতা সহর, বলা যায় কি···মানুষের পা পেছলাতে কতক্ষণ। তাছাড়া কলেজের পড়াশুনারও ক্ষতি হয়।

কল্‌কাতা সহর···মানুষের পা পেছলাতে কতক্ষণ !···

কথাটা মোহিনীর বুকে গিয়া ছ্যাঁৎ করিয়া আঘাত করিল। তবে কি তাহার স্বামীর পা পিছলাইয়াছে ? এই কথাটাই কি শশধর-দা তাহাকে ইঙ্গিতে আভাষ দিয়া দিল। মোহিনীর বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

—বড্ড ঘুম পাচ্চে, তুমি খাও শশধর-দা, আমি ঘরে চল্‌লাম।

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় রমেশ আসিয়া ডাকিল—মোহিনী ?

মোহিনী সাড়া দিল না, বালিশে মুখ গুঁজিয়া স্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিল।

রমেশ পুনরায় ডাকিল—ও মোহিনী, ঘুমোলে না কি ?

তথাপি মোহিনী কোন সাড়া দিল না। রমেশ বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বামুনঠাকুরকে ডাকিয়া খাবার দিতে বলিল। তাহার গলার সাড়া পাইতেই মন্দাকিনী তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ এত রাত্রি হল কেন, রমেশ?

—একটু কাজ ছিল পিসীমা।

বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া খাইতে বসিয়া গেল। মন্দাকিনী তাহার কাছে একখানি আসন টানিয়া বসিয়া বলিলেন—তা কাজ যতই থাক্ বাবা, এত রাত্রি ক'রো না। বৌমা ভারী অস্থির হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা।

রমেশ আহার শেষ করিয়া নীরবেই উঠিয়া পড়িল। মোহিনী তখনও তেমনি একইভাবে বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। এবার রমেশ গিয়া ডাকিতেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াই তার দুটি চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওকি! কি হ'ল মোহিনী, কাঁদছো কেন?

মোহিনী কোন উত্তর দিল না—চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমেশের বিস্ময়ের মাত্রা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সস্নেহে তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে মোহিনী, কাঁদছো কেন? আমায় ব'লবে না? লক্ষ্মীটি!

একটা হেঁচকা টানে মোহিনী হাতটা সরাইয়া লইয়া ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে বলিল—যাও, জানিনে!

রমেশ আবার তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। বাহির হইতে মন্দাকিনী ডাকিলেন—ও বৌমা, খেতে এস না! রাত কি আর আছে?

মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখের জল মুছিয়া বাহির হইয়া গেল। রমেশ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। এই এত কালের মধ্যে মোহিনীর এরূপ ব্যগ্র-কাতরতা সে আর একদিনও দেখে নাই।

—তেরো—

মন্দাকিনীর অনুরোধে নামমাত্র চাটি মুখে গুঁজিয়া মোহিনী ঘরে ফিরিয়া আসিল। রমেশ তখন নিবিষ্টমনে হারমোনিয়ামে সুর তুলিয়া গান ধরিয়াছে।

মোহিনী রুক্ষকণ্ঠে বলিল—এটা তোমার বেশ্যাবাড়ী নয়, যে, যখন তখন যে সে গান গাইতে পাবে!

রমেশ থতমত খাইয়া হারমোনিয়াম্ ছাড়িয়া দিল। মোহিনী স্বামীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি দিন দিন এত অধঃপাতে যাচ্ছ, কেন বল তো?

এ আকস্মিক প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, রমেশ বিস্মিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার কথার মানে?

ঝঙ্কার দিয়া মোহিনী বলিল—মানে আমি জানিনে। তুমি বুঝে দেখ।

—কথাটা কি খুলে না বল্লে, আমি কি করে মানে বুঝে দেখব?

—আচ্ছা, আজকাল রোজ-রোজ রাত্রে বাড়ী ফিরতে এত দেরী হয় কেন তোমার?

এবার তাহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিয়া রমেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—এইজন্যে তোমার এত রাগ বুঝি?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে মোহিনী বলিল—রাগ হবে না? তুমি এসেছ এখানে পড়াশুনা করতে। তুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত ইয়ারকি দিয়ে সময় কাটিয়ে এলে চলবে কেন?

—আচ্ছা, কাল থেকে আর রাত্রি করব না। বলিয়া রমেশ হাসিয়া মোহিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানার উপর নিজের পার্শ্বে বসাইল। মোহিনী কাঁদিয়া ফেলিল। মুখে কাপড় চাপা দিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—কেন তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কুসঙ্গে মিশতে গেলে!

রমেশের তুর্ব্বল বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—কে বল্লে আমি কুসঙ্গে মিশেছি?

—কেন, শশধর-দা বলেছে।...মেশোনি?

শশধরের নামটা হঠাৎ মোহিনীর মুখ হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শশধর তাহাকে এ-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন কথাই বলে নাই। রমেশও জানিত—সে যেরূপভাবে গোপনে কুসঙ্গে মেলামেশা করে, তাহাতে শশধর কিছুই সন্ধান পায় নাই। সে মনে করিল, তবে যে শশধর মোহিনীর নিকট তাহার বিরুদ্ধে লাগাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র একটা সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই, আর...আর-একটা কারণ ভাবিতেই হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে চিন্-

চিন্ করিয়া উঠিল। তবে কি শশধর এখনও মোহিনীকে ভালবাসে? এখনও কি তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে বলিয়া আশা রাখে?

মূর্খ রমেশ রূঢ়কণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী?

স্বামীর সে অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে মোহিনী চমকিয়া উঠিল, মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল—কি বল্‌ছ?

—শশধর আমার নামে তোমার কাছে খুব লাগায়—না?

মোহিনী বুঝিতে পারিল যে, সে হঠাৎ শশধরের নাম করিয়া ফেলায় স্বামী তাহার প্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে শশধরের নাম করিয়া সে যাহা কিছু বলিতে যাইবে তাহাতেই তাহার স্বামীর ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িবে। সে বলিল—না, সে তোমার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেনি।

রমেশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—তবে যে তুমি এখুনি তার নাম করলে?

মৃদু হাসিয়া মোহিনী স্বামীর একখানি হাত টানিয়া নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল— তোমার মন জান্‌বার জন্যে।

রমেশ বিশ্বাস করিল না, বলিল—মিথ্যে কথা!

ধৃত হাতখানাতে মৃদু চাপ দিয়া মোহিনী বলিল—মিথ্যে কথা কেন বল্‌ব, খুব সত্যি কথাই ব'লেছি।

—সব চালাকী। আমার কাছে মিথ্যে বল্‌তে তোমার একটুও লজ্জা হয় না, মোহিনী?

বলিয়া রমেশ নিজের হাতখানা টানিয়া লইতে যাইতেছিল, কিন্তু মোহিনী পরিহাসের সুরে বলিল—আচ্ছা, চট্ ক'রে তুমি এমন রেগে যাও

কেন বলতো ? ভালো হয়ে দুটো কথা ব'লবো—তাতেও তোমার রাগ ! নাও, খুব হ'য়েছে, এইবার শুয়ে পড়ো।

মোহিনী রমেশের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি বল দেখি, তুমি আজকাল এত রাত্রি করে বাড়ী ফের কেন ?

রমেশের বুক আবার টিপ্ টিপ্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব কর্‌তে কর্‌তে রাত্রি হয়ে যায়।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—ঠিক তো ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠিক—ঠিক।

সরলপ্রাণা মোহিনী বিশ্বাস করিল। তারপর স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আব্‌দারের স্বরে বলিল—তা যাই হোক, কাল থেকে আর তুমি রাত্রি করতে পাবে না।

রমেশ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন, আমাকে বুঝি তোমার বিশ্বাস হয় না ? রাতের বেলায় পাছে কোথায় হারিয়ে যাই, কে ফুস্‌লে নিয়ে পালায়···সদাই ভয় হয়, না ?

সত্যিই আমার বড় ভয় করে !

—কিসের ভয় ?

মোহিনী কথাটা মুখে আনিতে পারিল না—লজ্জায় কেবল রাঙা হইয়া উঠিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—বল না, কিসের ভয় ?

স্বামীর বুকের উপর মুখ লুকাইয়া মোহিনী বলিল—কি জানি !

একখানি হাত মোহিনীর পিঠের উপর রাখিয়া রমেশ বলিল—না মোহিনী, তোমার কী ভয় করে আমাকে বলতে হবে।

মোহিনী মুখ গুঁজিয়াই বলিল—তা আমি বলতে পারব না।

রমেশ জোর দিয়া বলিল—না, তোমাকে বলতেই হবে।

মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—কি হবে শুনে?

রমেশ হাসিয়া উত্তর করিল—আনন্দ হবে। খুসী হবো শুনে।

—মনে হয়, হয়তো তোমাকে কোন শয়তানী আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। হয়তো তুমি যেমনটি আছো তেমনটি আর থাকবে না।

কথাটা বলিয়াই মোহিনী তাড়াতাড়ি আবার স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। কিন্তু রমেশের সারা অন্তঃকরণ কি একটা অসহ্য বেদনায় ঝিন্-ঝিন্ করিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে এক সময় আলস্যের ভান করিয়া বলিল—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে মোহিনী।

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া মুহূর্ত্তকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরে বিনা বাক্যব্যয়ে মশারি ফেলিয়া দিয়া স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িল

রমেশ খানিক পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু মোহিনীর নয়নে নাই নিদ্রা, বুকে নাই নিশ্চিন্ততা! দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় আজ কে যেন কণ্টক বিছাইয়া দিয়াছে!

ঘড়িতে তিনটা বাজে, মোহিনী তখনও ছট্ ফট্ করিতেছে।

—চৌদ্দ—

রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। মন্দাকিনী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মোহিনীকে বলিলেন—রাত্রি বারটা তো বেজে গেল বৌমা, রমেশ তো এখনও ফিরল না?

স্বামীর উপর ক্রোধটা মোহিনীর পুরামাত্রায় হইলেও যতই তাহার আগমনের বিলম্ব হইতেছিল, ততই সেই ক্রোধের স্থান একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ভীত-মলিন মুখে মন্দাকিনীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—তাইতো পিসীমা! এত রাত্রি হল, এখনও তো ফিরল না। কি করা যায় বল দেখি? এ রকম তো কখনো হয় না!

মন্দাকিনী চিন্তা করিয়া বলিলেন—শশধরকে পাঠিয়ে একবার খোঁজ নিলে হয় না? এতখানি রাত হ'ল, কোথায় আছে, কি করছে ..

মোহিনী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। শশধর গিয়া যদি দেখে সেই রাক্ষুসীরা তাহার প্রাণের দেবতাকে অর্থলোভে হত্যা করিয়াছে! মোহিনী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটা যন্ত্রণামিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

মন্দাকিনী বলিলেন—তাই করি। একবার শশধরকেই পাঠিয়ে দিই।

মোহিনী আর কিছু বলিতে পারিল না। স্তব্ধভাবে মেঝের উপর বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

শশধরকে রমেশের সন্ধানে পাঠাইয়া দিয়া, মন্দাকিনী মোহিনীর নিকটে আসিয়া বলিলেন—তুমি আর ভেবে কি করবে মা, পার চাট্টি খেয়ে শুয়ে পড়গে। তারপর শশধর ফিরে এলে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

মোহিনী ব্যথা-কাতর দৃষ্টিতে মন্দাকিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—আমার ক্ষিদে নাই পিসীমা, আমি কিছু খাব না। তুমি খাবার খেয়ে শোওগে।

মন্দাকিনী বুঝিলেন, স্বামী অভুক্ত আছে বলিয়াই তাহার এ অক্ষুধা। সুতরাং তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—তা কি হয় মা! তুমি না খেলে কি আর কেউ খেতে পারে? চল, যা পার চাট্টি মুখে দিয়ে আসবে।

স্নেহস্পর্শে মোহিনীর অবরুদ্ধ অশ্রুরাশি দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—না পিসীমা, সত্যি বলছি, আমার খিদে নাই, আমি এখন কিছু খেতে পারব না।

মন্দাকিনী সস্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—কাঁদচ কেন মা? রমেশ বোধ হয় তার কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে খেলায় মেতে আছে। শশধর এখুনি তাকে নিয়ে আসবে। চল, যা পার চাট্টি মুখে দেবে। ভয় কি?

মোহিনী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। আহারের প্রতি ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দাকিনীর অনুরোধে গিয়া খাইতে বসিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শশধর বাসায় প্রবেশ করিতেই মোহিনী ব্যাকুল-হৃদয়ে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু শশধরের

সহিত স্বামীকে না দেখিয়া সে বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

শশধর তাহাকে থামাইয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—মোহিনী, তুমি অধীর হ'য়ো না। সব কথা আগে ভাল করে শোন। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রো।

মোহিনী চোখের জল মুছিয়া ধীরভাবে শশধরের কাছে বসিল। শশধর তখন সমস্ত ব্যাপার তাহাকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মোহিনী আবার বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে এখন উপায়, শশধর-দা?

শশধর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—বাবাকে সব কথা জানিয়ে, আসতে বল্‌তে হবে! তিনি যা ভাল ব্যবস্থা হয় করবেন।

মোহিনী হতাশকণ্ঠে বলিল—যা ভাল বোধ হয় তাই কর শশধর-দা! আমাকে যেন শেষে আত্মহত্যা করতে না হয়।

শশধর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—তার জন্যে তোমার কোন ভয় নাই মোহিনী। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ তোমার প্রাণে এতটুকু বেদনা লাগতে দেব না।

শশধরের চক্ষু দুইটিইও সজল হইয়া উঠিল। এই সময় মন্দাকিনী ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বাবা, রমেশের সন্ধান পেলে?

প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিয়া শশধর বলিল—হ্যাঁ পিসীমা, সে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল সকালে আসবে। আজ আর টানাটানি করলাম না।

মন্দাকিনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—যাক, ভাবনা থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল! এতখানি রাত হ'ল, ভেবে আর বাঁচিনি।

তারপর রমেশের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন· নেমন্তন্ন খেতে গেলি, তা বৌমাকে কি আমাকে বলে গেলেই ত পারতিস্ বাছা! এমন ছিষ্টিছাড়া ছেলেও দেখিনি। সব্বাইকে কি এমনি ক'রে ভাবিয়ে তুল্‌তে হয়! আসুক একবার।

মন্দাকিনী মৃদুস্বরে বকিতে বকিতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

শশধর বলিল—আর শুধু শুধু ভেবে কি করবে, মোহিনী? যাও, শোওগে। তারপর কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমি যখন আছি, তখন তোমার কোন ভয় নাই। বিপদ কাটবেই। অধীর হ'লে ত চল্‌বে না ভাই; ধীরে সুস্থে কাজ হাঁসিল করতে হবে।

—পনেরো—

পরদিন যখন বেলা নয়টার মধ্যেও রমেশের আগমনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন মোহিনীর বড় ভয় করিতে লাগিল। সে ব্যস্তভাবে পাঠ-নিরত শশধরের নিকট গিয়া হতাশকণ্ঠে বলিল—এখনও তো কই ফিরল না, শশধর-দা!

শশধর বই লইয়া বসিয়া ছিল বটে— কিন্তু পাঠে তাহার আদৌ মনঃসংযোগ হইতেছিল না। তাহার মন কেবলই অধীর-আগ্রহে রমেশের

প্রত্যাগমনের পথের দিকে চাহিয়াছিল। মোহিনীর হতাশ কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে ব্যাকুল ক্রন্দনের মতই ধ্বনিত হইল! সে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল—তাইত!

—এখন উপায়?

মোহিনীর দুই চক্ষু বহিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিল! শশধর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ভয় কি বোন্‌! আর একটু অপেক্ষা করে দেখি। যদি না আসে, আমি যেমন করে হোক্‌ তাকে এবার ধরে আন্‌বো—আন্‌বোই।

কৃতজ্ঞতায় মোহিনীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—রুদ্ধকণ্ঠে বলিল —আমার জন্য তোমাকে বড়ই অপমান সহ্য করতে হচ্চে শশধর-দা। তোমার ঋণ আমি জীবনে কখন শোধ করতে পারব না।

একটা অজানিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে শশধরের প্রাণ পূরিয়া উঠিল। মোহিনীর মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—না মোহিনী, এতে আমি একটুও অপমান বোধ করিনে—বরং প্রাণে অনাবিল তৃপ্তিই অনুভব করি। তোমার সুখের জন্যে আমি মান-অপমান মোটেই গ্রাহ্য করিনে।

মোহিনী গদগদকণ্ঠে বলিল—সে তোমায় নিজের গুণে শশধর-দা! আমাকে তুমি কত ভালবাস—তাকি আমি জানি না?

শশধরের প্রাণের কোন্‌ গোপন তন্ত্রীতে একটা মৃদু কম্পন বাজিয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—ভালবাসি ··তা হবে। তবে তোমার এতটুকু কষ্ট দেখলে আমার প্রাণে বড় বাজে।

—সেটাও ভালবাসার—

মোহিনীর কথা আর শেষ হইল না।—সহসা উন্মাদের ন্যায় টলিতে টলিতে রমেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে মোহিনীর গলা চাপিয়া ধরিল। শশধর চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—কর কি রমেশ—কর কি—হ'লো কি তোমার? করছো কি?

—তোমাদের ভালবাসাবাসির পুরস্কার দিচ্ছি, বলিয়া রমেশ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মোহিনীকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া একখানি কৌচের উপর ফেলিয়া দিল। মোহিনী একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত দেহে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া তাহার মাথা কাটিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল।

শশধর চীৎকার করিয়া উঠিল—ও পিসীমা, শীগ্‌গীর···ছুটে এস।

রমেশ পাগলের মত হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া তাহাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময় মন্দাকিনী ও বাসার একজন ভৃত্য উপস্থিত হওয়ায়, সে ভীত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই অবসরে শশধর ভৃত্যটীর সাহায্যে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। সে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। মন্দাকিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—একি সর্ব্বনাশ করলি বাবা রমেশ, বৌমা তোর কী দোষ করেছিল রে, তার সোণার অঙ্গ এমন করে ছেঁচে দিলি? —ওরে, ওযে কাল থেকে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছে! দাঁতে কুটো কাটেনি, রাতে ঘুমোয় নি।

শশধর মহা সমস্যায় পড়িল। একে বাসাতে এই ব্যাপার, তাহার উপর যদি পুলিশে এ-ব্যাপার সন্ধান পায় তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! এক-দিনেই ইস্‌লামপুর জমীদার-বংশের মান-ইজ্জৎ সব রসাতলে যাইবে।

সে তাড়াতাড়ি মন্দাকিনীর মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল—চুপ কর পিসীমা। বেশী গোলমাল হ'লে এখনি পুলিশ এসে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলবে—তখন রমেশকে বাঁচানো দায় হবে। এখন তাড়াতাড়ি মোহিনীর চোখে-মুখে জল দিয়ে ওকে একটু সুস্থ কর।

মন্দাকিনী অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মোহিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, অল্পক্ষণ পরেই মোহিনীর চৈতন্য হইল। সে "মাগো!" বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শশধর চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া তাহার উপর ন্যাকড়া দিয়া একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল, তারপর ঝিকে মেঝের উপর বিছানা করিয়া দিতে বলিল।

বিছানায় মোহিনীকে সাবধানে শোওয়াইয়া দিয়া, মন্দাকিনী ও ঝি পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

রমেশ এতক্ষণ ভৃত্যের স্কন্ধে মস্তক এলাইয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। শশধর কাছে গিয়া সজল-নেত্রে তাহার দিকে চাহিতেই সে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। শশধর তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—কেন তোমার এ দুর্ম্মতি ঘটল রমেশ? মোহিনী তো কোন দোষে দোষী নয়!

শশধরের দুই চক্ষু বহিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা ঝরিল। সে কিছুক্ষণ থামিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল—যাক্, য হবার তা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য ভেবে আর কোন ফল নাই। এখন তুমি শান্ত-ভাবে তোমার ঘরে গিয়ে শোওগে। আমি মোহিনীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শশধরের আদেশ পালন করিল,

শশধর: ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া মোহিনীর কাছে গিয়া বসিল। মোহিনীর তখন বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে মন্দাকিনীর সহিত ক্ষীণকণ্ঠে কি কথা বলিতেছিল।

শশধর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ডাকিল—মোহিনী!

মোহিনী মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল—কি বল্‌ছ, শশধর-দা?

বড় যন্ত্রণা হচ্চে কি?

তা হচ্চে বৈকি শশধর-দা! মাথাটা বড় টন্‌টন্ কচ্চে।

শশধর সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কোন ভয় নাই, ডাক্তার এসে ওষুধ-পত্র দলেই ওটা সেরে যাবে। তুমি বেশী কথা ব'লো না—চুপ করে শুয়ে থাক।

মোহিনী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। তিনি মোহিনীর মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া চমকিয়া উঠিলেন—ইস্—অনেকটা যে কেটে গিয়েছে। কি করে কাটলো?

শশধর ঝি ও ভৃত্যকে সরাইয়া দিয়া বলিল—ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গয়ে পড়ে গেছলো। কৌচের পায়ায় লেগে কেটে গিয়েছে।

মন্দাকিনী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—আঘাতটা কি খুব সাংঘাতিক ডাক্তারবাবু! বৌমা আমার বাঁচবে তো?

স্মিতমুখে ডাক্তারবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, আঘাতটা একটু বেশী ধরণেরই হয়েচে বটে, তবে তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই—সারতে দুদিন সময় বেশী লাগতে পারে, এই যা।

মন্দাকিনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তা সময় কিছু বেশী লাগুক বাবা,—তার জন্যে আমরা ভয় কচ্ছিনে।

মধু-মিলন—



ডাক্তারবাবু বলিলেন—তবে আর ভয়ের কারণ কিছু নাই,—প্রাণের কোন আশঙ্কা করবেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

ডাক্তারবাবু মোহিনীর ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিলেন। তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া শশধরকে বলিলেন—এঁকে কিছুদিন এখন বিশেষ সাবধানে রাখবেন,—বেশী নড়াচড়া যেন না করেন।

আহারাদির পর রমেশ শশধরের কাছে গিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল—ভাই শশধর, আমাকে ক্ষমা কর।

শশধর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আমার কাছে এমন কী অপরাধ করেছ রমেশ, যার জন্যে এ-ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে?

রমেশ আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল—অপরাধ? অপরাধ তোমার কাছে আমি যথেষ্টই করেছি শশধর। তুমি মোহিনীকে সহোদরা ভগ্নীর মত ভালবাস—কিন্তু আমি মধ্যে-মধ্যে তোমার সে-ভালবাসাও পাপচক্ষে দেখেছি। কতদিন কতভাবে তোমায় লাঞ্ছনা করতে গেছি। তোমার এ-হেন বন্ধুত্বকে অগ্রাহ্য করে, পাপের পথে দিনের পর দিন পা বাড়িয়ে চ'লেছি। এ অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়।

শশধর বলিল—তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আজ থেকে আর বদ্ সঙ্গে মিশে, কুস্থানে যেতে পাবে না।

রমেশ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল—সে প্রতিজ্ঞা আমি মোহিনীকে খুন করেই করেছি শশধর! পতিব্রতা স্ত্রীর চোখ বেয়ে জল আর দেহ ফেটে রক্ত যখন ঝ'রেছে, তখনই আমার অন্তরাত্মার হা-হুতাশে সে

তিজ্ঞা করতে আর ভাবতে হয়নি ভাই! তার জন্যে আর তোমার 'ছে স্বতন্ত্র প্রতিজ্ঞা করবার দরকার নাই!

শশধর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ভয় নাই—মোহিনী তোমাকে পরাধী করবে না। তুমি যদি নিজেকে শুধ্‌রে নাও—সেই হবে তার চেয়ে বড় আনন্দ!

ষোলো

ন পাঁচ-ছয় পরে শশধরের টেলিগ্রাম পাইয়া বলরামবাবু যখন লিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন, তখন মোহিনীর অবস্থা অত্যন্ত ংঘাতিক দাঁড়াইয়াছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে সে কেবলই প্রলাপ কিতেছিল। দেহে আর এক বিন্দুও রক্ত নাই—কঙ্কালাবশেষ দেহ' ছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার সে অবস্থা দেখিয়া বলরামবাবু লকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—মায়ের আমার এমন বস্থা—আর তোমরা দু'জনেই এখানে থেকেও, দু'দিন আগে আমাকে কটা সংবাদ দিলে না!

শশধর ও রমেশের মস্তক যেন অপরাধের গুরুভারে একেবারে বনত হইয়া মাটির সাথে মিশিয়া গেল।

ঘটনার পর দিনই রমেশ বলরামবাবুকে টেলিগ্রাম করিতে উদ্যত ইয়াছিল—কিন্তু সামান্য অসুখ—দুই দিনেই সারিয়া যাইবে ভাবিয়া । ডাক্তারের আশাসবাণী পাইয়া শশধর তাহাকে বাধা দিয়াছিল—বলিয়াছিল—ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, তখন

শুধু শুধু তাঁকে টেলিগ্রাম করে এনে লাভ কি? যদি অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি দেখি, তবে একখানা চিঠি লিখে দিলেই হবে।

সুতরাং প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও রমেশ আর টেলিগ্রাম করিতে পারে নাই। তারপর তিন চার দিন পর যখন মোহিনীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতে লাগিল, তখন উভয়েই বুঝিতে পারিল বলরামবাবুকে পূর্ব্বে টেলিগ্রাম না করাটাই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। শশধর সেই দিনই—'মোহিনী সাংঘাতিক পীড়িত—সত্বর আসুন।' বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিল।

বলরামবাবু কিছুক্ষণ পরে রোদন বেগ সম্বরণ করিয়া অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হইলেন। শশধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যাক্, যা হ'য়ে গিয়েছে, তা হ'য়ে গিয়েছে,—এখন যাতে ওর ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তাই কর।

শশধর বলিল—চিকিৎসার তো কোন ক্রটী হয়নি বাবা,—ক'লকাতার নামজাদা ডাক্তারকেই ওর চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করেছি।

রমেশ বলিল—হ্যাঁ,—ডাক্তারটি খুব ভাল বটে। তবে আমার মনে হয় আর একজন সাহেব-ডাক্তারকে ডাকলে বোধ হয় উনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসার সুবিধা করতে পারেন।

বলরামবাবু বলিলেন—বেশ, আজই একজন ভাল সাহেব ডাক্তারকে আনা হোক্, আমার তো বাবা অবস্থা দেখে একটুও ভরসা হচ্ছে না!

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে পূর্ব্বনিযুক্ত ডাক্তারবাবু ও সাহেব-ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহিনীকে পরীক্ষা করিলেন। তারপর সাহেব-ডাক্তার পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী-ডাক্তারকে

বলিলেন—আমার মনে হয়, রোগিণীর শরীরে রক্তের অত্যন্ত অভাব হয়েছে।

বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু তাঁহার কথার সমর্থন করিলেন। সাহেব-ডাক্তার বলিলেন—এ-ক্ষেত্রে একজন সুস্থ লোকের তাজা রক্ত রোগিণীর দেহে ইন্‌জেক্ট্ করলে বোধ হয় যথেষ্ট সুফলের আশা করা যেতে পারে। আপনি কি বলেন ?

বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু তাহাই স্বীকার করিলেন।

সাহেব-ডাক্তার বলিলেন—তাহলে আর বৃথা বিলম্ব করে লাভ কি ? কাল্‌কের দিনটা দেখে, পরশুই এই ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলুন ?

বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু সম্মত হইয়া শশধরকে ডাকিয়া বলিলেন—সাহেব-ডাক্তার যা বল্লেন, তা খুব ভাল যুক্তি! এখন আপনাদের মধ্যে যিনি রক্ত দিতে সম্মত, তিনি কাল মন স্থির করে ঠিক হয়ে থাক্‌বেন। কাল আমরা তাঁর রক্ত পরীক্ষা করে দেখব,—রোগিণীর পক্ষে সেটা উপযুক্ত হবে কিনা।

শশধর নীরবে সম্মতি জানাইল। ডাক্তারবাবুরা ভিজিট লইয়া সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বলরামবাবু গোপনে রমেশকে ডাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—তাহলে রমেশ, মোহিনীর দেহে জীবনীসঞ্চার করতে কে রক্ত দেবে ?—আমি তো বৃদ্ধ, হয়তো এ-রক্তে তেমন শক্তি নাই, তুমিই…

রক্ত! রমেশের দুর্ব্বল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল—আমার রক্ত কি ওর শরীরে ঠিক উপযুক্ত হবে ?

বলরামবাবু তাহার ভীতিভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সে কাল

ডাক্তারেরা পরীক্ষা কল্লেই বুঝতে পারবেন। তবে যদি তুমি দিতে ভয় কর, তাহলে কাজ নাই—আমিই দেব। বুড়োর রক্ত, শক্তি তার কতটুকু? তবু দিতে হবে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান—তাহলে আমার রক্তেই—

রমেশ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি! আপনি দেবেন রক্ত!

বলরামবাবু বলিলেন—তা নইলে আর কে দেবে বল? এক তুমি তার স্বামী—তুমি দিতে পার, আর না হয় আমি তার পিতা—আমি দিতে পারি।

রমেশ লজ্জিত হইয়া বলিল—তা তো বটেই,—তবে আমি বলছিলাম কি, কোন জন্তুর রক্ত দিলে যদি চলে, তাহলে আর আমাদেরকে এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হ'ত না।

স্নেহের হাসি হাসিয়া বলরামবাবু বলিলেন—তুমি হয়তো এটা খুব কষ্টের ব্যাপার মনে কচ্চ—কারণ ধনীর সন্তান তুমি, তোমার জীবন খুব দামী মনে করতে পার—কিন্তু আমি এতে একটুও কষ্টবোধ করব না—বরং মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি অনুভব করব। মোহিনী যে আমার কন্যা—আমারই দেহের অংশ—আমার আত্মার চেয়েও যে সে বড়!

রমেশ নিরুত্তর হইয়া মাথা নীচু করিল। বলরামবাবু বলিলেন—তাছাড়া কোন পশুর রক্তে বোধ হয় কাজ হবে না, হলে নিশ্চয়ই ডাক্তাররা আমাদের সেইরকম পরামর্শ দিতেন। যাক্, তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই—রক্ত আমিই দেব।

রমেশ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শশধর বলরামবাবুর নিকটে গিয়া ডাকিল—বাবা!

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া যাওয়ার পরই, বলরামবাবু অধীর হইয়া কন্যার কথা ভাবিতে বসিয়াছিলেন। একটা কথা আজ সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ায় তাঁহাকে বড়ই বিচলিত করিয়াছিল। রমেশের হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করিয়া যে তিনি তাহাকে সুখী করিতে পারেন নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। পিতা যাহার দেবতা-সদৃশ চরিত্রবান, তাহার হস্তে মোহিনী কখনও অসুখী হইবে না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বের ওই ঘটনায় তাঁহার সে-বিশ্বাস এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। যে স্বামী পত্নীর জন্য এই সামান্য ত্যাগটুকু স্বীকার করিতে পারে না, সে তো কোনমতেই স্বামীর উপযুক্ত নয়,—হয়ত মানুষেরও উপযুক্ত নয়। একজনের প্রাণ দান করিবার জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করা—সে তো মানুষের এক মহান্ কর্ত্তব্য। তবে কি তিনি না বুঝিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যাকে একটা বর্ব্বর পশুর হস্তে সঁপিয়া দিয়া তাহাকে সারাজীবনের জন্যই দারুণ দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন!

বলরামবাবুর দুই চক্ষু বহিয়া হু-হু করিয়া জল ছুটিতে লাগিল। তিনি শশধরের আহ্বান শুনিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সজল-নয়নে তাহার দিকে চাহিলেন।

তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া শশধরেরও দুইটী চোখ সজল হইয়া উঠিল। বলিল—আপনি কাঁদছেন কেন, বাবা?

কোঁচার কাপড়ে চোখের জল মুছিয়া বলরামবাবু বলিলেন—সাধে আমার চোখ দিয়ে জল বেরোয়নি শশধর! বড় যাতনাতেই এ জলধারা ছুটে এসেছে।

শশধর মনে করিল, বোধ হয় তিনি মোহিনীর অসুখের কথা ভাবিয়াই অন্তরে এরূপ আঘাত পাইয়াছেন ; তাই বলিল—মোহিনীর জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না বাবা, ডাক্তাররা তো বলে গেলেন—ইন্‌জেক্‌সনের পর হতেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

ভারী-গলায় বলরামবাবু বলিলেন—মোহিনীর অসুখের জন্য আমার এ চোখের জল নয় বাবা, তার অদৃষ্টের কথা ভেবেই—

বলরামবাবুর দুই চোখ বহিয়া পুনরায় অবিরাম ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

শশধর বড়ই বিস্মিত হইল। তবে কি তিনি রমেশের কু-কীর্ত্তির কথা সমস্তই শুনিয়াছেন ? সে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে বলরামবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বলরামবাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—একটু আগে রমেশকে ডেকে মোহিনীর জন্য রক্ত দিবার কথা বলেছিলাম—

শশধর বলিল—ও তা পারবে না বাবা। ও বেজায় ভীতু। রক্ত আমিই দেব—তার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।

বলরামবাবু চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—না, তোমাকে দিতে হবে না—আমিই দেব। তবে রমেশ স্বামী হয়ে যে কি করে কথাটা অস্বীকার করলে, তাই ভেবে আমার মনে বড় কষ্ট হয় শশধর !

শশধর এবার বুঝিতে পারিল তাঁহার ব্যথা কোথায়। সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মোহিনীকে ভালবাসে না বলেই যে ও রক্ত দিতে চায়নি তা নয় বাবা ! ও বড়ই ভীতু—একটু রক্ত দেখলে মূর্চ্ছা যায়। সেইজন্যই বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

বলরামবাবু বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—যেখানে সত্যি-সত্যিই প্রাণের টান থাকে, সেখানে ভয় ব'লে কোন জিনিষ ঠাঁই পায় না শশধর।

ইহার উত্তরে শশধর কিছুই বলিতে পারিল না—নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বলরামবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—যাক্—তার জন্য এখন আর ভেবে কি করব? তবে তুমি একটু ওকে বুঝিও যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা বজায় রাখতে হলে স্বামীকেও কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

বলরামবাবু ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। শশধর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে প'ড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

সতেরো

উপর্য্যুপরি তিন দিন শশধরের রক্ত মোহিনীর দেহে ইন্‌জেক্ট্‌ করার পর, তাহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন হইতে জ্বরের উত্তাপ কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানও ফিরিয়া আসিল।

বলরামবাবু একদিন মোহিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শশধরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহ-গদগদকণ্ঠে বলিলেন—বাবা শশধর, তুমিই এ যাত্রা আমার মোহিনীর প্রাণ দান কল্লে। তোমার ঋণ—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া শশধর বলিল—সে কি বাবা! আমি যে

আপনার পুত্র, সে কথা কি ভুলে গেলেন?—মোহিনী যে আমার বোন্!

বলরামবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না—আনন্দ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, মোহিনী! তুমি যেন ভুলে না যাও,—এ-যাত্রা তোমার শশধর-দাই তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ মানুষকে কেমন করে বাঁচায়—শশধর আজ তার প্রমাণ করে দিলে।

মোহিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—সে কথা কি আমি ভুলতে পারি বাবা! শশধর-দা যে আমাকে কতখানি স্নেহ করে,—নিজের প্রাণের বিনিময়ে যে আমাকে রক্ষা করতে পারে, তা কেবল এই ঘটনায় কেন, এর অনেক আগে থেকে বুঝতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতায় মোহিনীর চক্ষুর্দ্বয় ছল-ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখে নিজের প্রশংসাবাদ শুনিয়া শশধরের সারা অন্তঃকরণ জুড়িয়া অজ্ঞাত-পূর্ব্ব এক অনাস্বাদিত হর্ষের ঢেউ খেলিতে লাগিল। সে সলজ্জভাবে বলিল—ও-সব কী যা-তা বলছ মোহিনী! আমি আর তোমার কি করতে পারি? করলামই বা কী? এ-তো মানুষেরই কাজ।

বলরামবাবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বা ওর জন্তে না করছ তুমি শশধর! যার জন্তে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পার—

শশধর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—অমন করে আমায় বাড়িয়ে বলবেন না বাবা! আমি আপনার—

মোহিনী বলিল—বাবা তো কিছুই বাড়িয়ে বলেনি শশধর-দা! তুমি যে আমাকে কতদূর ভালবাস, তা মুখের কথায় প্রকাশ করা যায় না।

—তুমি শুদ্ধ আবার সুরু করলে, মোহিনী? আমাকে বুঝি আর তোমাদের কাছে থাকতে দেবে না? বলিয়া মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বলরামবাবু মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—পাগলা ছেলে!

—এমনি পাগলা যেন সবাই হয় বাবা! বলিয়া মোহিনী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বলরামবাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

রমেশ মোহিনীর ঘরে শুইতে গেলে, মোহিনী মৃদু হাসিয়া বলিল-আচ্ছা, সেদিন তোমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, না?

রমেশ লজ্জিত হইয়া বলিল—কতকটা তাই বটে।

—এখন তো সেটা ছেড়েছে, না মধ্যে-মধ্যে ভর করে?

মোহিনীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রমে' হাস্তপূর্ণ স্বরে বলিল—ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বল্‌ব?

মোহিনী স্বামীর হাতের মধ্যে একটা মৃদু চাপ দিয়া বলিল - নির্ভয়েই বল!

—ভূতটা এখনও সম্পূর্ণরূপে ছাড়েনি মোহিনী, এখনও মধ্যে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে।

মোহিনীর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। সে চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি?

—সত্যি!

—কি কর্‌লে ছাড়বে বল্‌তে পার ?

—পারি।

—তবে তাই করে ছাড়াতে পার না কেন ?

—পারিনে তার কারণ ওষুধটা তোমার হাতে।

বলিয়া রমেশ আবেগভরে স্ত্রীর শীর্ণগণ্ডে একটী চুম্বন করিল। সে স্পর্শে মোহিনীর সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া একটা পুলক শিহরণ বসন্ত-বাতাসের মত শির্‌ শির্‌ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর ?

রমেশ তাহার একখানি হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া উত্তর করিল—অবিশ্বাস ঠিক করিনে—তবে সেদিনকার তোমাদের ভালবাসাবাসির কথা আমার কাণে তেমন ভাল শোনায়নি।

মোহিনী মৃদু হাসিয়া বলিল—বোধ হয়, সেটা তোমার আগের রাত্রিকার নেশার ফল।...শশধর-দা সত্যি সত্যিই দেবতা।

রমেশ অন্যমনস্কভাবে বলিল—তা হতে পারে হয় তো।—সেদিন মদের নেশায় আমার মাথাটাও তত ভাল ছিল না। কাজেই হঠাৎ "ভালবাসা" কথাটা কাণে যেতেই চটে আগুন হয়ে গিয়েছিলাম। যাক্‌—তার জন্যে এখন আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত। আশা করি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

অনুতাপে রমেশের দুই চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল—মোহিনী তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—ছিঃ—ও কথা কি বলতে আছে ? তুমি যে আমার স্বামী—ইহ-পরকালের জাগ্রত দেবতা। কিন্তু একটা কথা আজ গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলো—শশধর-দাকে—

রমেশ বলিল —না মোহিনী, ভুল আমার সত্যিই ভেঙেছে। আমি যে এত কাল ধরে অন্যায়ের পাছুতেই ছুটে চলেছিলাম, বুঝতে তো আর বাকি নাই। শশধরের বন্ধুত্ব আমার গৌরব, শশধরের ভগ্নী-স্নেহ তোমার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফল।···সামান্য-ভয়ে আঁৎকে উঠে আমি আমার দেহ থেকে রক্ত দিতে পারি নি—দিলে তা শশধর!!—স্বার্থ তার কতটুকু? অথচ আমি স্বামী, আমারই নিঃশ্বাস ব'য়ে তুমি বেঁচে থাকবে! এই রক্ত আমার কাছে তুচ্ছ হলেও ভাবলাম আমি বড়, আর শশধর হাস্তে হাস্তে আমাকে জয় করলে! যাকে করেছিলাম—বুদ্ধির দোষে সন্দেহ, সেই-ই জোর করে আমার দলিত বুকের মাঝে ফুলের মালা পরিয়ে দিলে!—সে আমাকে জয় করলে যে ভাবে, লাভ করলেও ঠিক তেমনি ভাবে। শশধর আমার বন্ধু—আমার ভাই—আমার আপনার চেয়েও অতি আপনার।

মোহিনী মুগ্ধ-দৃষ্টিতে স্বামার পানে চাহিয়া রহিল, চোখ-দুটি তাব আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল।

আঠারো

সেদিন পূর্ণিমা। জলস্থল-আকাশ-বাতাস প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্না-রাশি সমুদ্র-বারির মত ফুলিয়া ফাঁপিয়া যেন থৈ-থৈ করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া শশধর শুনিল রমেশকে লইয়া বলরামবাবু বাজার করিতে বাহির হইয়াছেন—ফিরিতে একটু রাত্রি হইবারই সম্ভাবনা। সে জামাকাপড় ছাড়িয়া খানিকক্ষণ এধার-

আমার মৃত্যু হ'লে আমি বাঁচতাম·· শশধর-দা !—সত্যি-সত্যিই তুমি আমার সেই শশধর-দা ?—যে আমাকে যমের হাত থেকে—

শশধর উন্মত্তের ন্যায় ঘাড় দোলাইয়া বিকৃতস্বরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি—আমি। তোমার স্বর্গের দেবতা শশধর-দা আজ এত নীচে নেমে পড়েছে ! কিন্তু আর না— মাথায় নরকের কীট প্রবেশ করেছিল তাই। আজ এখনি তোমার সম্মুখে সে কীটটাকে মেরে ফেল্‌তে হবে, নইলে তাকে আর বিশ্বাস নাই।

ইন্‌জেকৃসনের জন্য শশধরের হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল, তাহাই সে ক্ষিপ্র হস্তে খুলিয়া ফেলিয়া বোঁ-বোঁ করিয়া হাতখানা ঘুরাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সেই ক্ষত স্থান হইতে তীরবেগে রক্তের ফিন্‌কি ছুটিয়া চলিতে লাগিল। মোহিনী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো কে আছো,—শীগ্গীর এস—শশধর দা খুন হ'ল ! আমার শশধর-দা না বুঝে নিজের হাতে খুন হ'ল - ওগো কে কোথায় আছো—

মন্দাকিনী ও ঝি ছুটিয়া আসিল। একটু পরেই রমেশ আসিল—বলরামবাবু আসিলেন, কিন্তু শশধরকে উন্মাদের ন্যায় ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

বলরামবাবু বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। রমেশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ক্ষিপ্র হস্তে শশধরের হাতে আর একটা নূতন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। তারপর ভৃত্যকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া শশধরের চোখে-মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

করিল। ডাক্তারবাবু তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

দিন ছয় সাত পরে শশধর যখন অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিল, তখন একদিন মোহিনীকে নিকটে ডাকিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল—মোহিনী, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু কপাল আমার মন্দ, তাই আবার তোমাকে পোড়া মুখ দেখাতে হচ্ছে! জানি দিদি, এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই, তবু—আজ দুহাত যোড় ক'রে বলছি—আমাকে যদি মাপ করতে পারো ভাই!…যদি তোমার শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে—তবে তোমার শশধর-দাকে মার্জ্জনা করো।

শশধরের প্রশ্ন শুনিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে মোহিনী বলিল—শশধর-দা, কেন তুমি বৃথা অত অনুতপ্ত হচ্চ? তুমি তো জ্ঞানকৃত কোন পাপ করনি!

শশধর আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ, ঠিক কথা, তখন আমার জ্ঞান ছিল না—শয়তান আমার ঘাড়ে চেপেছিল। সেই আমাকে সব করিয়েছে বোন্!

তাহার দুই চক্ষু বহিয়া হুহু করিয়া অশ্রুধারা ছুটিল।

মোহিনী সস্নেহে কহিল—তা আমি সেই দিনই বুঝতে পেরেছি, শশধর-দা। নইলে যার মনে সত্যি সত্যিই কোন পাপ থাকে, সে কখনই অত বড় একটা প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছায় করতে পারে না।

শশধরের বুক হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। সে তৃপ্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, মোহিনী?

মোহিনী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—কোনো অপরাধ না পেলে কি করে ক্ষমা করতে হয় তা তো আমি জানিনে শশধর-দা!

শশধর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। মোহিনী একখানি পাখা লইয়া নীরবে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে শশধর মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—রমেশকে কি তুমি সব কথা খুলে বলেছ?

মৃদু হাসিয়া মোহিনী বলিল—হ্যাঁ—বলেছি।

—সে কি আমার উপর রাগ করেছে?

পাখাটা নামাইয়া রাখিয়া মোহিনী বলিল—না শশধর-দা, সে তোমার পর একটুও রাগ করেনি। সে আর সে মানুষ নাই। তোমার সংস্পর্শে এইবার যথার্থই সে দেবতা হয়েছে। আমারই মত সে-ও তোমার কোনো অপরাধ গ্রহণ করতে পারেনি।

—ভগবান্! তোমার এত করুণা! শশধরের হৃদয় নিবিড় শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

পরদিন সমস্ত জিনিষ-পত্র গুছাইয়া সন্ধ্যায় গাড়ীতে সকলে মিলিয়া যখন ইস্‌লামপুর যাত্রা করিল, তখন রমেশ মোহিনীর কানে-কানে বলিল—কেমন মোহিনী, এইবার সেই গানটা গাইবো,—সেই যে—'আমি-রে মোর সোহাগ-পাখী……'

মোহিনীর মুখখানা গোলাপের মত রাঙা হইয়া উঠিল।

—শেষ—

এক টাকা সংস্করণের খানকয়েক বই

পূর্ণ শশীদেবী

১। অনুরাগ

পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

২। গাঁটছড়া

৩। সুরমা

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। চাঁদের কণা

৫। মৃতসঞ্জীবনী

৬। কল্পতরু

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৭। কল্পনাদেবী

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

৮। সতীর জ্যোতি

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

৯। প্রেমের হাট

প্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায়

১০। বাঙ্গালীর মা

১১। সিরাজউদ্দৌল্লা

১২। রাজার ছেলে

ভূধর নাথ মুখোপাধ্যায়

১৩। মিলনের পথে

প্রভাবতী দেবী

১৪। সুখের ঘর

১৫। সোনার বাঙ্গালা

১৬। সোনার চাঁদ

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৭। অপরূপ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৮। ছায়াছবি

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

১৯। অদল বদল

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

২০। মুক্তির বাঁধন

২১। মালাবদল

প্রভাস চন্দ্র ঘোষ

২২। হীরের আংটী

বরদা প্রসন্ন দাসগুপ্ত

২৩। বড়ঘরের মেয়ে

২৪। শুভদৃষ্টি